চার্লস ডিকেন্স

# অলিভার টুইস্ট

ডঃ মিলন দত্ত

ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ
৫৭-সি, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৬০

প্রকাশক :
সি. ভট্টাচার্য
ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাঃ লিমিটেড
৫৭ সি, কলেজ স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
বিলাস হাজরা
মডার্ন প্রিন্টার্স
৬১/বি, শ্যামপুকুর স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৪

## ॥ লেখক পরিচিতি ॥

চার্লস ডিকেন্সের জন্ম ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডের ল্যাণ্ডপোর্ট শহরে। পিতা জন ডিকেন্স ছিলেন গরীব কেরানী।

চার্লস ডিকেন্সের ছেলেবেলা কেটেছে খুব দুঃখ কষ্ট দারিদ্রের মধ্যে। অনাহারে কেটেছে বহু দিন। তবু এই অবস্থার মধ্যেও তিনি সমানে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লেখেন প্রথম উপন্যাস 'স্কেচেজ বাই রাজ'। এরপর একে একে রচনা করেছেন 'পিকউইক পেপারস', 'অলিভার টুইষ্ট', 'নিকোলাস নিকলবি', 'ডেভিড কপারফিল্ড', 'এ টেল অব টু সিটিজ' প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ। প্রথম প্রথম লিখে একটা পয়সাও পেতেন না, পরে প্রতি বইয়ের জন্যে পেতেন প্রায় দেড় লক্ষ টাকা।

'অলিভার টুইষ্ট' বইটি তিনি লিখেছিলেন লণ্ডনের অনাথ আশ্রমের দুরবস্থার উপর ভিত্তি করে। অনাথ আশ্রমের কর্তৃপক্ষ অনাথ বালকদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাতেন। ডিকেন্স এই উপন্যাসে অনাথ আশ্রমের বাস্তব বিবরণ প্রকাশ করবার পর লণ্ডনে দারুণ আলোড়ন সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত আইন পাশ করে এই অত্যাচার বন্ধ করা হয়। ডিকেন্সের উপন্যাসে আছে সমকালীন ইংরাজ জীবনের নিখুঁত চিত্র।

১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে এই বিশ্ববিখ্যাত সাহিত্যিকের দেহান্তর ঘটে।

## আমাদের অন্যান্য অনুবাদ গ্রন্থাবলী

- ট্রেজার আইল্যাণ্ড
- কন্যায়ো ভাদিস
- অ্যাডভেঞ্চার অব টম সয়ার
- ফ্রাঙ্কেনস্টাইন
- ডঃ জেকিল মিঃ হাইড
- লা মিজারেবল্
- হাঞ্চ ব্যাক অব নত্রোরডম
- লাস্ট ডেজ অব পম্পেই

# অলিভার টুইস্ট

## ॥ অলিভারের জন্ম ॥

ইংলণ্ডের কোন এক শহরের জনবহুল রাস্তা।

কত মানুষ ব্যস্তভাবে যাতায়াত করছে। গাড়ীঘোড়া চলাচল করছে।

একটা অল্পবয়েসী বউ কোনমতে টলতে টলতে এসে রাস্তার এক কোণে বসে পড়ল। দেখে মনে হয় বড় ঘরের বউ। মুখখানা শুকনো। সারাদিন খাওয়া জোটেনি। রাস্তায় বসে পড়েই বউটি অজ্ঞান হয়ে পড়ল।

চারধারে ভিড় জমে গেল। লোকজন ধরাধরি করে কাছের এক সরকারী অনাথ আশ্রমে দিয়ে এল। অনাথ আশ্রমের একজন ডাক্তার আছে। ওষুধ-পত্তর নেই। কোনমতে ঠেকা দিয়ে কাজ চালাতে হয় তাকে।

ডাক্তার এসে বউটিকে দেখে বিরস মুখে বললেন, বউটির বাচ্চা হবে। ব্যবস্থা কর।

ব্যবস্থা আর কে করবে। বউটি কোথা থেকে এসেছে, তার আত্মীয়-স্বজন কে আছে কেউ জানে না। অনাথ আশ্রমের এক বুড়ী ধাই আছে। সেই যা পারল জোগাড় করল।

সকালের দিকে শিশুর কান্নায় আশ্রম সরগরম হয়ে উঠল।

শিশুর মা একদৃষ্টিতে শিশুর দিকে তাকিয়ে রইল। তার চোখ দিয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল। রক্তশূন্য ফ্যাকাশে ঠোঁটখানা বাচ্চার কপালে চেপে ধরে সে চোখ বুজল। শরীর স্থির হয়ে গেল।

ডাক্তার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, হতভাগিনী চলে গেল। কোথা থেকে এসেছিল মেয়েটি ?

বুড়ী ধাই বলল, কে জানে কোথা থেকে এসেছিল। হাঁটতে

হাঁটতে পায়ের জুতো জোড়া ছিঁড়ে গেছে। মনে হয় অনেক দূর থেকেই এসেছিল।

ডাক্তার বললেন, বাচ্চাটা খুব রোগা। একটু দেখাশোনা করো।

বুড়ী ধাই বলল, সে আর তোমায় বলতে হবে না বাপু। আমাদের সদাশয় সরকার বাহাদুর যতটুকু দেখার ঠিকই দেখবে।

এরপর শিশুটি অনাথ আশ্রমের বাসিন্দা হয়ে গেল। তার গায়ে চাপানো হল অনাথ আশ্রমের বিদঘুটে জামা।

অনাথ আশ্রমের শিশুদের জন্যে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা সরকার থেকে বরাদ্দ থাকে। এর অধিকাংশই চুরি করে আশ্রমের কর্তৃপক্ষ। শিশুদের প্রায় না খাইয়েই রাখা হয়। একটু দুধের জন্যে কেঁদে গলা ফাটালেও কেউ তাদের দিকে ফিরে তাকায় না। অনেক সময় গলা টিপে ধরেও তাদের কান্না থামানো হয়। এই ভাবে অনাদর অনাহার আর অবহেলার মধ্যে শিশু বেঁচে থাকে কিংবা মরে যায়।

এই শিশুটির ভাগ্যেও সেই একই ব্যাপার ঘটল। কোনমতে বেঁচে রইল সে। কয়েক মাস বাদে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল আর একটি অনাথ আশ্রমে।

এই আশ্রমের পরিচালিকা হলেন মিসেস ম্যান নামে এক জাঁদরেল মহিলা। এই মহিলা যেমন নিষ্ঠুর তেমনি স্বার্থপর। বাচ্চাদের জন্যে সরকারী বরাদ্দের অধিকাংশই তিনি চুরি করতেন। কারণে অকারণে বাচ্চাদের শাস্তি দেওয়া তাঁর কাছে ছিল একটা মজার ব্যাপার।

মিসেস ম্যানের খপ্পরে পড়ে অধিকাংশ শিশুর মৃত্যু হত। না খেয়ে খেয়ে রোগে ভুগে কজনের আর বাঁচার মতো শক্তি থাকে?

তবু সেই শিশুটি বেঁচে রইল শুধু নিজের জীবনীশক্তির জোরে। নয় দশ বছর বয়স হল। রোগা রক্তশূন্য ফ্যাকাশে চেহারা।

কিন্তু রোগা চেহারা হলে হবে কি। রোগা ছেলেটার তেজ

যথেষ্ট। অন্যায় কথা শুনলে ফুঁসে ওঠে। তার জন্যে তাকে শাস্তিও পেতে হয় প্রচুর। মিসেস ম্যান উঠতে বসতে তাকে শাস্তি দেন। আর যত রকমে পারেন হেনস্থা করেন।

অনাথ আশ্রমের কয়লা রাখার একটি অন্ধকার কুঠুরী আছে। সেখানে কয়লা রাখা হয়, আবার দুষ্টু ছেলেদের জেলখানা হিসাবেও সেটা ব্যবহার করা হয়। মিসেস ম্যান অনাথ ছেলেটাকে প্রায়ই ওখানে না খেতে দিয়ে আটকে রাখেন।

এর মধ্যে একদিন অনাথ আশ্রম দেখতে এলেন মিষ্টার বাম্বল। তিনি আবার কর্তৃপক্ষের মধ্যে একজন বিশিষ্ট মানুষ। তিনি এসেই সেই ছেলেটার খোঁজ করলেন।

রোগা ন বছরের ছেলেটাকে তাঁর সামনে হাজির করা হল। ছেলেটা মাথা উঁচু করে দাঁড়াল।

মিষ্টার বাম্বল চশমার মধ্যে দিয়ে তার আপাদ মস্তক দেখতে লাগলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, এর কোন নাম রাখা হয়েছে কি?

—না। মিসেস ম্যান বললেন, এর বাপ মার পরিচয় কিছু জানতে পারলেন কি?

—কোন হদিসই করতে পারিনি। মিষ্টার বাম্বল বললেন, তবে নাম ছাড়া এর চলবে কি করে? একটা নাম তো রাখতে হবে।

—রাখুন না আপনি।

—আমাকে রাখতে বলছো? মিষ্টার বাম্বল বললেন, তা নামকরণে আমার বেশ কিছুটা খ্যাতি আছে বৈকি। এর নাম থাক অলিভার—অলিভার টুইষ্ট। কেমন নাম হল?

—বেশ নাম। এখন থেকে একে আমরা অলিভার টুইষ্ট বলেই ডাকবো।

—ডাকার আর সুযোগ পাবে কি করে? একে তো শহরের প্রধান কেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে।

—কেন? মিসেস ম্যান অবাক হলেন।

—সেই রকমই পরিচালকদের নির্দেশ। মিষ্টার বাম্বল গম্ভীর গলায় বললেন, পরিচালকরা ওকে দেখতে চান।

—বেশ তো। নিয়ে যান ওকে। তাহলে আমিও বাঁচি।

—কেন? ওকে নিয়ে গেলে তুমি বাঁচবে কেন?

—নিজেই বুঝতে পারবেন। আমি আর কি বলবো। এক বছর হাড় ভাজা ভাজা করে দিয়েছে। ভীষণ বজ্জাত।

—এইটুকু ছেলে ভীষণ বজ্জাত! মিষ্টার বাম্বল অবাক হলেন।

—ওর হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি।

—আমার মনে হয় তোমার এখানে ট্রেনিং ঠিকমতো হচ্ছে না। আমার ওখানে গেলে ঠিক হয়ে যাবে।

—নিয়ে দেখুন।

বলে মিসেস ম্যান সামনে দাঁড়ানো অলিভারের দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকালেন।

—মিষ্টার অলিভার টুইষ্ট, তাহলে যাবার জন্যে তৈরী হও।

অলিভার এক ছুটে চলে গেল সঙ্গীসাথীদের খবর দিতে।

## ॥ এবার শহরের অনাথ আশ্রমে ॥

অলিভারকে এনে রাখা হল শহরের অনাথ আশ্রমে। অনাথ আশ্রমে ছেলেদের দিয়ে নানা কাজ করিয়ে নেওয়া হত।

পরিচালকরা বলতেন এতে ছেলেদের আত্মনির্ভরশীল করে তোলা হবে। আসলে ছেলেদের দিয়ে যে সব জিনিস তৈরী করা হত, সেগুলো বাজারে বিক্রি করে ভালো টাকা কামাতেন কর্তৃপক্ষ।

অলিভারকে লাগিয়ে দেওয়া হল দড়ি পাকানোর কাজে। রোজ তাকে এত এত সুতা জড়িয়ে মোটা মোটা দড়ি তৈরী করতে হয়।

এই আশ্রমের ছেলেদের খাওয়ার জন্যে বরাদ্দ ছিল যবের তৈরী পাতলা ঝোল। সেই ঝোল দেওয়া হত এক হাতা করে। রবিবারে দেওয়া হত এক চিলতে মাখন। সেই সঙ্গে একটি করে

পেঁয়াজ।

মাত্র তিন হাতা ঝোল। তাও তিন বারে দেওয়া হয়। এতে কি পেটের আগুন নেভে? ছেলেরা জুল জুল করে তাকিয়ে থাকে ওই মণ্ডের গামলার দিকে। কারো সাহস নেই আর এক হাতা চাইবার।

অলিভার আসবার পর তারা তাকেই বলল, তুই একটু বল না আর এক হাতা দিতে।

অলিভার রাজী হয়ে গেল।

সেদিন আশ্রমের পরিবেশক ছেলেদের প্লেটে যথারীতি এক হাতা করে ঝোল ঢেলে দিচ্ছে। অলিভার উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আর এক হাতা করে মণ্ড দিয়ে যাও।

—কি বললে? চোখ কপালে উঠল পরিবেশকের। অনাথ আশ্রমের কোন ছেলে যে মণ্ড চাইবার সাহস দেখাতে পারে, একথা সে কোনদিনই ভাবেনি।

—বলছি আমাদের খুব খিদে পেয়েছে। আর এক হাতা করে ঝোল দাও।

—দিচ্ছি তোমাকে আর এক হাতা ঝোল।

পরিবেশক রেগে গিয়ে অলিভারকে হাতা দিয়ে এক বাড়ি মারল। তারপর সোজা গিয়ে মিষ্টার বাম্বলের কাছে সব ঘটনা জানাল।

শুনে মিষ্টার বাম্বলেরও চোখ কপালে উঠল। অনাথ আশ্রমের ছেলের এত সাহস। এখন এক হাতা মণ্ড চাইছে। পরে আরও কত কিছু চাইবে। অনাথ আশ্রমের সব ছেলেকে এ বিগড়ে দেবে। একে এখনি বিদায় করা ভাল।

মিষ্টার বাম্বল ছুটতে ছুটতে গেলেন আশ্রমের বড়কর্তা মিষ্টার লিম্বকিনের কাছে।

—কর্তা, কর্তা, সর্বনাশ হয়েছে।

বড় কর্তা তখন সবেমাত্র পরিপাটি করে খেয়ে-দেয়ে ইজি চেয়ারে

শুয়ে চোখ বুজেছেন। মিষ্টার বাম্বলের কথা শুনে চোখ খুলে বললেন, কি ব্যাপার? ষাঁড়ের মতো চেঁচাচ্ছো কেন?

—আজ্ঞে অলিভার এক হাতা বেশী ঝোল চেয়েছে।

—বেশী ঝোল চেয়েছে? তার মানে? মিষ্টার লিম্বকিনের চোখ কপালে উঠল।

—মানে তো কিছুই বুঝতে পারছি না স্যার। আপনার এই সব রাস্তার ছেলেদের জন্যে এত খাবার-দাবার দেন, অথচ ওরা বাড়তি খাবার চায় কেন তা তো বুঝতে পারি না।

মিষ্টার লিম্বকিন বললেন, তুমি জানো এই বাড়তি এক হাতা ঝোল দিতে গেলে বাড়তি কত টাকা ব্যয় হবে?

—তা কি আর জানি না স্যার।

মিষ্টার লিম্বকিন বললেন, ডাক তো দেখি সেই ছোঁড়াটাকে।

মিষ্টার বাম্বল গিয়ে টানতে টানতে নিয়ে এলো অলিভারকে, মিষ্টার লিম্বকিন চোখ পাকিয়ে বললেন, এ্যাই ছোঁড়া, তুই নাকি বাড়তি এক হাতা ঝোল চেয়েছিস?

অলিভার কাতর কণ্ঠে বলল, আজ্ঞে এক হাতা ঝোলে তো পেট ভরে না। তাই আর এক হাতা চেয়েছি। আপনার দয়ায় ওটুকু পেলে তবু একটু পেট ভরবে। মিষ্টার লিম্বকিন বললেন, না—না এসব তো ভাল কথা নয়। এক হাতা ঝোলে পেট যথেষ্ট ভরে যায়। তোকে আর এখানে রাখা হবে না।

লিম্বকিনের তর্জন-গর্জনে অলিভার ভয়ে কাঁপতে থাকে। মিষ্টার লিম্বকিন মিষ্টার বাম্বলকে বললেন, তুমি আজই পরিচালকমণ্ডলীর সভা ডাক। সেখানে এই বেয়াদপ ছোঁড়াটাকে তাড়ানোর আদেশটা পাশ করিয়ে নিতে হবে।

সেদিন সন্ধ্যায় পরিচালকমণ্ডলীর সভা হল। সভায় ঠিক হল, অলিভারকে শাস্তিদানের পর এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

মিষ্টার বাম্বল অলিভারকে এক নির্জন ঘরে আটকে রাখলেন। তাকে কোন খাবার দেওয়া হল না। এরপর তিনি আশ্রমের দরজার

উপর এক নোটিশ ঝুলিয়ে দিলেন—

আশ্রমের একটি বালককে ভাড়া দেওয়া হবে। যদি কেউ তাকে নিয়ে যান, তবে তাকে পাঁচ পাউণ্ড দেওয়া হবে।

অনেকেই এই নোটিশ পড়ল। কিন্তু কেউই অলিভারকে নিতে এল না।

বন্দী অবস্থায় সাত দিন কেটে গেল সেই নির্জন ঘরের মধ্যে। চারধারে অন্ধকার। আলো বাতাস ঢোকে না। অলিভার বসে বসে শুধু কাঁদে।

একদিন মিষ্টার গ্যামফিল্ড যাচ্ছেন ওই আশ্রমের পাশ দিয়ে। তাঁর লোক দরকার নেই, কিন্তু টাকার দরকার। অনেক টাকা বাড়ি ভাড়া বাকী পড়েছে। বাড়িওয়ালা তাগাদা দিচ্ছে। যে ভাবেই হোক টাকা জোগাড় করতে হবে।

ওই নোটিশ দেখে গ্যামফিল্ড খুব খুশি। সটান গিয়ে কর্তাকে বললেন, এই ছেলেটিকে আমি নিয়ে যাব। আমায় পাঁচ পাউণ্ড দিন।

—ছেলেটিকে আপনি কি কাজের জন্যে নেবেন?

—ওকে আমি আমার সব কাজের সহকারী করে নেব। আমাকে পাঁচ পাউণ্ড—

—পাঁচ পাউণ্ড দিতে পারব না। দুই এক পাউণ্ড হলে দিতে পারি।

—বাঃ। নোটিশে যে লেখা আছে পাঁচ পাউণ্ড।

—যখন লেখা হয়েছিল তখন এলে পাঁচ পাউণ্ডই পেতেন। এখন অনেকদিন হয়ে গেছে।

—বেশ চার পাউণ্ড দিন।

—না, দু' পাউণ্ড।

দু পক্ষের দর কষাকষিতে সাড়ে তিন পাউণ্ড রফা হল। গ্যামফিল্ড ভাবলেন, যাক গে বাবা, যা পাওয়া যাচ্ছে তাতেই লাভ। আমি কি আর ওকে রাখব নাকি? ওকে কোথাও কাজে লাগিয়ে দিয়ে সেখান থেকেও কিছু ঝাড়ব আমি।

গ্যামফিল্ড নগদ সাড়ে তিন পাউণ্ড আর সেই সঙ্গে অলিভারকে নিয়ে আশ্রম ছাড়লেন।

তিনি ভেবেছিলেন, অলিভারকে কোথাও কাজে লাগিয়ে দিয়ে তার খাটনির টাকাটা তিনি মেরে দেবেন।

কিন্তু অলিভারকে কাজে লাগানোর আগে ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতির দরকার।

গ্যামফিল্ড ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি আনতে গেলেন। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট অনুমতি দিলেন না। গ্যামফিল্ড তখন আবার অলিভারকে অনাথ আশ্রমে ফেরত দিয়ে এলেন। সেই সাড়ে তিন পাউণ্ডও ফেরত দিতে হল সেই সঙ্গে।

মিষ্টার বাম্বল আবার দরজায় বিজ্ঞাপন ঝুলিয়ে দিলেন।

কিন্তু কেউ আর এবার এল না। তখন মিষ্টার বাম্বল নিজেই বেরোলেন—কোথায় খদ্দের পাওয়া যায় কিনা।

খুঁজতে খুঁজতে দেখা পেলেন মিষ্টার সোয়ার বেরীর।

## ॥ কফিন বিক্রির কাজে ॥

মিষ্টার সোয়ার বেরীর কফিনের ব্যবসা। তাঁর কফিন বিক্রির দোকান আছে। কফিন বিক্রির জন্যে একটা ছেলে দরকার।

তিনি অলিভারকে নিয়ে কফিন বিক্রির কাজে লাগিয়ে দিলেন। তাঁর দোকানে অনেক কফিন। সেখানেই শোয়ার ব্যবস্থা হল অলিভারের।

একদিন কফিন বিক্রি করতে করতে খুব ক্লান্ত হয়ে দরজা ভেজিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল অলিভার। সেই সময় ঘরের দরজায় দমাদম লাথি।

অলিভার তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেখল, একটা বয়স্ক ছেলে দাঁড়িয়ে। মুখখানা পাকা।

অলিভার বিনীতভাবে বলল, আপনার কি কফিন দরকার? বয়স্ক ছেলেটি মুখ খিস্তি করে বলল, তোর জন্যেই কফিন দরকার

হতভাগা। জানিস তুই কার সাথে কথা বলছিস!

অলিভার হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে রইল।

বয়স্ক ছেলেটি অলিভারের পাছায় এক লাথি মেরে বলল, জেনে রাখ আমি হচ্ছি নোয়া ক্লেপেলি তোর উপরআলা। তোকে সব সময় আমারই হুকুমে চলতে হবে—বুঝলি।

অলিভার ঘাড় নাড়ল।

নোয়া ভারিক্কী চালে বলল, শুনলাম তুই অনাথ আশ্রম থেকে এসেছিস—তোর বাপ-মার কোন হদিশ পাওয়া যায়নি।

অলিভার কোন উত্তর দিল না।

নোয়া বলল, তুই সত্যিই একটি হতভাগা। যার বাপ-মার হদিশ পাওয়া যায় না, সে হতভাগা ছাড়া আর কি।

নোয়া নিজেও অনাথ আশ্রমের ছেলে। কিন্তু তার বাপ মায়ের একটা পরিচয় আছে। তার মা ধোপানী, আর বাবা মাতাল সৈনিক। এই জন্যে নোয়ার মনে বেশ একটা গর্ব আছে।

অলিভারের বাপ মার কোন পরিচয় নেই জেনে সে তাকে তাচ্ছিল্য করতে লাগল। এমন ভাব দেখাতে লাগল যেন সে অলিভারের চেয়ে অনেক উঁচু দরের মানুষ।

কথায় কথায় সে অলিভারকে কিল চড় মারে—অকথা কুকথা বলে।

অলিভার নীরবে সব সহ্য করে। সহ্য না করে উপায় কি। এখানে দুটো খেতে পরতে পারছে এই ঢের। সে নিজের মনে কাজ করে। খদ্দের এলে কফিন দেখায়। ওর মুখে সব সময় একটা বিষাদের ছায়া ভাসে। তাছাড়া ও মানুষের সঙ্গে খুব মিষ্টি গলায় কথা বলতে পারে। দোকানে যে সব শোকার্ত মানুষ কফিন কিনতে আসে, তাদের দুঃখে সহানুভূতি জানায়। ফলে দোকানের বিক্রি বেড়ে যায়।

দোকানের মালিক মিষ্টার সোয়ার বেরী খুব খুশি। তিনি অলিভারকে আর একটু উঁচু পদ দিলেন। বেতনও কিছু বাড়ল।



এতে নোয়া গেল বেজায় চটে। অলিভার নিজের কাজ দেখিয়ে তাকে ডিঙিয়ে গেছে। সে অলিভারকে জব্দ করবার ছুতো খুঁজতে লাগল। তার উপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেল। যখন তখন কিল চড় ঘুষি।

অলিভার দাঁতে দাঁত চেপে সব কিছু সহ্য করে।

নোয়া একদিন বলল, এই হতভাগা, তোর মার সম্বন্ধে কোন খবর রাখিস?

অলিভার বলল, আমার মা মারা গেছেন।

নোয়া বলল, মরে গেছে আপদ গেছে। তোর মা ছিল একটা বদ মেয়েছেলে।

অলিভার চোখ লাল করে বলল, খবরদার, ওকথা বলবে না।

নোয়া বলল, ইস আবার চোখ রাঙানো হচ্ছে। বলেছি, হাজারবার বলবো—তোর মা ছিল একটা বদ মেয়েছেলে।

অলিভার বাঘের মতো লাফ দিয়ে নোয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মাটিতে ফেলে দিল। তারপর পাগলের মতো তার টুঁটি ধরে ঝাঁকাতে লাগল।

নোয়া মাটিতে পড়ে ডাক ছেড়ে চেঁচাতে লাগল, কে আছো? বাঁচাও। অলিভার আমাকে খুন করে ফেলল।

ওর চেঁচানি শুনে ছুটে এলেন সোয়ার বেরী গিন্নী। আর তার পেছন পেছন শার্লটি।

ওদের দেখে নোয়া আরও চেঁচাতে লাগল যেন তাকে সত্যি সত্যি মেরে ফেলছে অলিভার।

শার্লটি ছুটে গিয়ে অলিভারের বুকে পিঠে কিল চড় মারতে লাগল। আর সোয়ার বেরী গিন্নী অলিভারকে চেপে ধরে আঁচড়ে খামচে ক্ষতবিক্ষত করে দিলেন।

তারপর ওকে দুজনে ধরে টানতে টানতে এনে কয়লা রাখার ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিলেন।

নোয়া তখনও মাটিতে পড়ে চিঁচিঁ করছিল। সোয়ার বেরী

তাকে টেনে তুলে বললেন, তুমি শীগগীর অনাথ আশ্রমে মিষ্টার বাম্বলের কাছে ছুটে চলে যাও। তাকে সব ঘটনা বলে এখানে ডেকে নিয়ে এসো।

নোয়া ছুটতে ছুটতে চলে গেল মিষ্টার বাম্বলের কাছে। মিষ্টার বাম্বল নোয়ার ওই চেহারা দেখে অবাক। মাথার চুল এলোমেলো। চোখে কালশিরা।

—কি ব্যাপার ?

—শীগগীর আসুন। আপনার আশ্রমে। অলিভার আজ মিসেস সোয়ার বেরী, শার্লটি আর আমাকে প্রায় মেরেই ফেলেছিল।

—সে কি ? কি হয়েছিল ?

—কিছু হয়নি। অলিভার খুব বদ মেজাজী। আপনি এক্ষুনি চলুন।

—চল। যাচ্ছি।

মিষ্টার বাম্বল নোয়ার সঙ্গে থপথপ করতে করতে ছুটলেন সোয়ার বেরীর বাড়ির দিকে।

সোয়ার বেরী গিন্নীর মুখে সব শুনে বললেন, কোথায় অলিভার ?

—তাকে কয়লার ঘরে আটকে রাখা হয়েছে।

—বেশ করেছেন। চলুন দেখি।

ওরা সবাই কয়লার ঘরের সামনে হাজির। মিষ্টার বাম্বল হেঁড়ে গলায় বললেন, অলিভার আছো ?

—আছি। দরজাটা খুলে দিন।

—আমাকে চিনতে পারছো ?

—খুব পারছি। আপনি মিষ্টার বাম্বল।

—এবার ভয় পাচ্ছো তো ?

—একটুও না।

অলিভারের কথা শুনে বেশ ঘাবড়ে গেলেন মিষ্টার বাম্বল। তার নাম শুনেও ভয় পাচ্ছে না ছেলেটা। এ আবার কি ব্যাপার।

তিনি সোয়ার বেরী গিন্নীর দিকে তাকিয়ে বললেন, কি

ব্যাপার ? আমাকে ভয় পাচ্ছে না কেন ? সোয়ার বেরী গিন্নী চোখ কপালে তুলে বললেন, আপনার মতো লোককে যখন ভয় পাচ্ছে না, তখন বুঝতে হবে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

—মাথা খারাপ হয়নি, মিষ্টার বাম্বল বললেন, আসলে মাথা গরম হয়ে গেছে ওর। আপনার বাড়িতে বেশী বেশী মাংস খেয়েই ওর মাথা গরম হয়ে গেছে।

—কি করবো। আমার আবার দয়ার শরীর।

—না—না—এই সব বাজে ছেলেদের প্রতি দয়া দেখানো ঠিক না।

এই সময় মিষ্টার সোয়ার বেরী বাড়িতে ঢুকলেন। সব কথা শুনে তিনি রেগে আগুন হয়ে তক্ষুনি কয়লা ঘরের দরজা খুলে জামার কলার ধরে অলিভারকে টানতে টানতে বাইরে বের করে নিয়ে এলেন। বাইরে এনেই কানের উপর খুব জোরে এক ঘুষি মেরে বললেন, বল হতভাগা, তুই নোয়াকে মেরেছিস কেন ?

অলিভার শক্তমুখে বলল, ও আমার মাকে গাল দিয়েছিল কেন ?

সোয়ার বেরীর গিন্নী বললেন, গাল দিয়েছিল বেশ করেছিল। তোর মা বেজায় খারাপ মেয়ে ছিল।

অলিভার রূঢ় কণ্ঠে বলল, না আমার মা খারাপ মেয়ে ছিল না।

—আমি বলছি তোর মা খারাপ মেয়ে ছিল।

—আপনি মিথ্যে কথা বলছেন।

—কি। আমি মিথ্যে কথা বলছি ? তার মানে আমি মিথ্যাবাদী ! ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেললেন সোয়ার বেরী গিন্নী, চিরদিন আমি সত্যি কথা বলে এলাম। আর আজ আমার কপালে এই অপবাদ।

বউয়ের কান্না দেখে মিষ্টার সোয়ার বেরী আবার রেগে গিয়ে আর এক প্রস্থ পিটুনি দিলেন অলিভারকে। কিল চড় ঘুষি মেরে তিনি অলিভারকে মাটিতে শুইয়ে দিলেন।

সোয়ার বেরী গিন্নী মুগ্ধ চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

হ্যাঁ। পুরুষ একেই বলে। অপরাধীকে শাস্তি এমন করেই দিতে হয়। বাছাধনকে আচ্ছা করে শাসন করা হয়েছে। এরপর ট্যাঁ ফো করুক তো দেখি।

অলিভারের অবস্থা দেখে মিষ্টার বাম্বলও বেজায় খুশি। তিনি বললেন, ভেবেছিলাম, এবার বেত মেরে অলিভারকে শায়েস্তা করবো। যাক আপনার কল্যাণে আর বেত ব্যবহার করতে হল না।

প্রচণ্ড মার খেয়ে অলিভার মাটিতে পড়ে রইল। সোয়ার বেরী ওদের নিয়ে চললেন চা-টা খাওয়াতে। অনেক পরিশ্রম ওদের। এবার একটু ভালো করে খাইয়ে দিতে হবে।

## ॥ লণ্ডনের পথে ॥

অলিভার একা পড়ে রইল কয়লা ঘরের সামনে। ওর জন্যে কেউ সামান্য একটু খাবার নিয়ে এল না। কিংবা এল না কোন খোঁজও নিতে। অলিভার অনেকক্ষণ একা একা কাঁদল।

কাঁদতে কাঁদতে ঠিক করে ফেলল, এখানে আর থাকবে না। এখান থেকে চলে যাবে লণ্ডনে। সারা রাত ঘুম হল না। ভোর হবার আগেই অলিভার মিষ্টার সোয়ার বেরীর বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে এল। সঙ্গে নিল নিজের জামা-কাপড়ের একটা পুটলি।

রাস্তায় নেমেই হাঁটতে শুরু করল অলিভার। কোথাও থামল না। হাঁটতে হাঁটতে কয়েক মাইল পথ পেরিয়ে এল সে।

অলিভার এক নাগাড়ে হেঁটে চলল। লণ্ডন শহর ওর লক্ষ্য। হাঁটতে হাঁটতে জামা-প্যাণ্ট ছিঁড়ে গেল। মুখ চোখ বিবর্ণ হয়ে গেল। কখনও খাওয়া জোটে, কখনও জোটে না। রাত্তির হলে কোন বাড়ির বারান্দায় শুয়ে পড়ে। হাঁটতে হাঁটতে ক্লান্তিতে পা ভেঙে আসে। লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করে, লণ্ডন শহর আর কতদূর?

—অনেক দূর। এখনও অনেকটা পথ হাঁটতে হবে।



পা টেনে টেনে আবার অলিভার পথ চলতে থাকে। শুধু চলা আর চলা।

আবার দুদিন কেটে গেল। হাঁটতে হাঁটতে ঢুকল একটা শহরে। হাঁটারও বোধহয় আর শক্তি নেই। একটা বাড়ির দরজার সামনে বসে হাঁপাতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর সেখানে এসে হাজির হল একটি ছেলে। পরনে বড়দের ঢিলেঢালা পোশাক।

অলিভারকে ওভাবে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, কি ব্যাপার? তুমি বসে আছো কেন?

অলিভার বলল, অনেকখানি পথ হেঁটে এসেছি কিনা।

—খাওয়া-দাওয়া হয়েছে?

—না। মাথা নাড়ল অলিভার, পয়সা-কড়ি নেই। খাবো কি দিয়ে।

—কদিন খাওনি?

—অনেক দিন।

—এসো আমার সাথে।

ছেলেটি অলিভারের হাত ধরে নিয়ে গেল একটা দোকানে। সেখানে নিজের পয়সা দিয়ে কিছু রুটি মাংস কিনে অলিভারকে খাওয়াল।

অলিভার গোগ্রাসে সেই রুটি মাংস খেতে লাগল।

ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, তুমি যাবে কোথায়?

অলিভার বলল, লণ্ডনে যাবো।

—সেখানে থাকবার জায়গা আছে?

—নেই।

—বাঃ চমৎকার। ছেলেটি হেসে বলল, লণ্ডনে যাচ্ছো, অথচ থাকবার জায়গা নেই। পয়সা কড়িও নেই। চমৎকার। অলিভার ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

ছেলেটি বলল, ঠিক আছে। ঘাবড়াও মৎ। আমি হচ্ছি জ্যাক

ডকিন্স। আমি ঠিক একটা ব্যবস্থা করে দেব।

—তুমিও লণ্ডনে যাচ্ছো নাকি ?

—তোমার জন্যেই যেতে হবে।

—লণ্ডন শহর এখান থেকে কত দূর ?

—বেশী দূর না। সন্ধ্যার মধ্যেই সেখানে পৌঁছে যাবো। খাওয়া শেষ হলে অলিভারকে নিয়ে জ্যাক ডকিন্স পথে নামল।

## ॥ লণ্ডনে ফ্যাগিনের ডেরায় ॥

সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে। লণ্ডনের পথ কুয়াশার চাদরে ঢাকা।

জ্যাক অলিভারকে নিয়ে এ গলি সে গলি দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। গেট খুলে ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ও। তারপর খুব জোরে একটা শিস দিল।

সেই বাড়ির উপরের ঘরের একটা জানলা খুলে গেল। সেই খোলা জানালায় দেখা গেল একটা মানুষের মুখ। হাতে একটা জ্বলন্ত মোমবাতি।

মানুষটি জিজ্ঞাসা করল, কে তুমি ?

জ্যাক বলল, ওস্তাদ।

উপর থেকে মানুষটি আবার বলল, সঙ্গে কে ?

জ্যাক বলল, বন্ধু। ফ্যাগিন কোথায় ?

—উপরে আছে। এসো।

ভাঙাচোরা নড়বড়ে সিঁড়ি। জ্যাক সেই সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে উপরে উঠে গেল। অলিভার উঠল বহু কষ্টে।

উপরে উঠে জ্যাকের পিছন পিছন সে ঢুকল একটা নীচু ছাদওয়ালা ঘরে।

ঘরের মাঝখানে একটা বড় টেবিল। টেবিলের চারপাশে কয়েকটি অল্পবয়েসী ছেলে মদ খাচ্ছে। টেবিলের উপর একটা পাঁউরুটি,

মাখন আর ছুরি। একপাশে একটা আলনা। তার উপর অনেকগুলি সিল্কের রুমাল ঝুলছে।

জ্যাককে দেখেই ছেলেগুলো হৈ চৈ করে উঠল। ফ্যাগিন সামনে এসে দাঁড়াল। কুঁতকুঁতে চোখ। দেখলেই ভয় লাগে।

বলল, এই জ্যাক, এটাকে জোটালি কোথা থেকে? জ্যাক বলল, রাস্তা থেকে জুটিয়ে আনলাম। কাজে লাগানো যাবে।

ফ্যাগিন বলল, বাড়ি কোথায়? এতদিন কি করত?

—অতশত জানি না বাপু। লণ্ডনে ওর থাকা খাওয়ার জায়গা নেই। তার একটা ব্যবস্থা করে দাও তো।

ফ্যাগিন চুপ করে কিছুক্ষণ কি ভাবল। তারপর বলল, ঠিক আছে। সে ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এখন তোদের সঙ্গে থাক তো।

অলিভার ওখানে রয়ে গেল। ওখানে যে সব ছেলে থাকে, তারা যে কি করে তা সে কিছুই বুঝতে পারে না। এরা অন্য সব ভদ্রঘরের ছেলেদের মতো নয়। সকাল হলে সকলেই ঢোলা ঢোলা জামা প্যান্ট পরে কোথায় বেরিয়ে যায়। ফিরে এসে ফ্যাগিনের সাথে ফিসফিস করে কি সব কথা বলে। জ্যাক, চার্লি আরও নানান ছেলে একই কাজ করে।

কয়েকদিন পর জ্যাক বলল. অলিভার, চল আজ আমরা একটু বাইরে বেড়িয়ে আসি।

অলিভার সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে জ্যাকের পিছু নিল। চার্লিও ওদের সঙ্গে গেল।

## ॥ পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার ॥

চার্লি আর জ্যাক অলিভারকে নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল। দুজনের পরণেই লম্বা ঝুলের জামা প্যান্ট।

পথের পাশে আলু পেঁয়াজের দোকান। চার্লি ওস্তাদ ছেলে। দোকানগুলোর পাশ দিয়ে যাবার সময় কি কায়দায় মুঠো মুঠো

আলু পেঁয়াজ তুলে নিয়ে জামা প্যান্টের পকেটে ভরে ফেলল। অলিভার ওর কায়দা দেখে অবাক।

সামনে একটা বইয়ের দোকান। এক ভদ্রলোক দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে এক মনে একটা বই পড়ছেন। পোশাক দেখে মনে হয়, বেশ বড়লোক।

জ্যাক বলল, লোকটাকে বেশ মালদার মনে হচ্ছে।

চার্লি বলল, পকেটে মাল আছে নিশ্চয়।

জ্যাক বলল, শব্দ করবি না। আমার পাশে পাশে চলে আয়।

জ্যাকের পিছন পিছন ওরা দুজন হাঁটতে লাগল।

ভদ্রলোক একমনে বই পড়ছেন। কোনদিকে খেয়াল নেই। বইয়ের মধ্যে ডুবে আছেন।

জ্যাক পা টিপে টিপে ভদ্রলোকের পাশে গিয়ে দাঁড়াল, তারপর নিমেষে তাঁর কোটের পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা সিল্কের রুমাল বের করে নিল, আর মুহূর্তের মধ্যে সেটি পাচার করে দিল চার্লির কাছে।

তারপর দুজন ছুট লাগাল।

অলিভার ওদের কাণ্ড দেখে হতভম্ব হয়ে গিয়েছিল। সে এবার বুঝতে পারল, যাদের পাল্লায় সে পড়েছে, তারা আসলে পকেটমার। এরা ধনী ব্যক্তির পকেট থেকে সিল্কের রুমাল হাতিয়ে নেয়। এক একটা রুমালের দাম একশো টাকা। এইজন্যেই ফ্যাগিনের ঘরের আলনায় এত রুমাল ঝোলে।

অলিভার কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ওদের পিছু পিছু ছুটতে লাগল।

আর ঠিক সেই সময় ভদ্রলোক পকেটে হাত দিলেন। হাত দিয়েই খেয়াল হল, পকেটে রুমাল নেই। অলিভারকে ছুটতে দেখে ভাবলেন, ওই ছেলেটাই তার রুমাল সরিয়েছে।

তিনি 'চোর' 'চোর' বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে রাস্তার লোকজনও 'চোর' 'চোর' বলে চেঁচাতে লাগল।

জ্যাক আর চার্লি এ লাইনে পাকা। তারা এতক্ষণ অনেকটা পথ ছুটে এসেছে। এবার একটা বাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে পড়ল।

ওদিকে অলিভার প্রাণপণে ছুটে চলেছে। লোকে মনে করল, ওই ছেলেটাই চোর। তারা ছুটতে লাগল অলিভারের পিছন পিছন।

একটা গুণ্ডা ধরনের লোক অলিভারের কাছে গিয়ে তার ঘাড়ে খুব জোরে আঘাত করল। অলিভার মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রাস্তার উপরে। তার মাথা দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। বহু লোক তার চারদিকে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে।

ততক্ষণে সেই বই-পড়া ভদ্রলোকটিও সেখানে হাজির হয়েছেন। অলিভারকে ওইভাবে রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে তার মনটা ব্যথায় ভরে উঠল। আহা! ছেলেটার মুখখানা কি কোমল। এই ছেলে কি চোর হতে পারে?

গুণ্ডা মতো লোকটি এসে বলল, স্যার, এই ছেলেটি আপনার পকেট মেরেছে। এক ঘুষিতে একে আমি শুইয়ে দিয়েছি।

—ভারী বীরত্বের কাজ করেছো এইটুকু ছেলেকে মেরে। ভদ্রলোক বিরক্ত হয়ে বললেন।

—স্যার, আমার বকশিস। সেই গুণ্ডা লোকটি বলল।

—কিসের বকশিস? ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন।

—বাঃ। আমি যে ছেলেটিকে চিৎ করে ফেললাম।

—বকশিস টকশিস তুমি পাবে না। যত ঝামেলা।

এই সময় সেখানে পুলিশ এসে উপস্থিত। কেউ গিয়ে ডেকে এনেছে। পুলিশ এসেই অলিভারকে টেনে হিঁচড়ে দাঁড় করাল।

তারপর বিজ্ঞের মতো বলল, এ পাকা বদমাস দেখছি। উপস্থিত লোকজনও পুলিশের কথায় সায় দিল।

—একে থানায় যেতে হবে। কার পকেট মেরেছে?

উপস্থিত লোকজন সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোককে দেখিয়ে দিল। পুলিশ তখন বলল, স্যার আপনাকেও আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে।

—আমি থানায় যাবো কেন ? ভদ্রলোক বিব্রত কণ্ঠে বললেন।

—থানায় দারোগা সাহেব আছেন। তিনি যা ভাল বোঝেন করবেন। আপনি আসুন আমার সাথে।

অলিভারের শরীর অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। সেই অবস্থায় তাকে টেনে নিয়ে চলল পুলিশ।

থানায় বসেছিলেন এক গোঁফওয়ালা পেট মোটা বিশালবপু দারোগা। তিনি সব ঘটনা শুনে পুলিশকে বললেন, ছোঁড়াটাকে হাজতে পুরে কয়েক ঘা লাগাও। তারপর ওর শরীর তল্লাসী করো। হারানো মাল পেয়ে যাবে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, হারানো মাল আমার চাই না। ওকে মারধোর করবেন না।

দারোগা সাহেব ভারিক্কী কণ্ঠে ভুঁড়ি নাচিয়ে বললেন, আপনার কথায় কিছু হবে না। আইন যাবে তার নিজের পথে।

পুলিশ অলিভারকে হাজতে পুরে কয়েকটা চড় চাপড় কষাল। তারপর তার দেহ তল্লাসী হল। কিছুই পাওয়া গেল না।

দারোগা সাহেবেব মেজাজ চড়ে গেল। তিনি চেঁচিয়ে বললেন, ছোঁড়াটাকে বিচারের জন্যে চালান করে দাও ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে। সেখানে যা হয় হবে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বললেন, আবার এসব ঝামেলা কেন!—

দারোগা সাহেব গম্ভীর গলায়বললেন, আপনি চুপ করুন মশাই। আইন তার নিজের পথে যাবে।

পুলিশ এসে অলিভারকে নিয়ে চলল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

দারোগা সাহেব দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, আপনি দাঁড়িয়ে রইলেন যে মশাই। আপনাকেও তো যেতে হবে।

—আমাকে আবার কোথায় যেতে হবে ?

—ম্যাজিষ্ট্রেট ফ্যাঙ্গের আদালতে।

—বই পডতে গিয়ে ভারী ঝামেলায় পড়লাম দেখছি।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বিড় বিড় করে বলতে বলতে ওদের সঙ্গে চললেন ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালতে।

## ॥ ম্যাজিষ্ট্রেট ফ্যাঙ্গের বিচার ॥

ম্যাজিষ্ট্রেট ফ্যাঙ্গ আদালতে চেয়ারের উপর বসে কি একটা পত্রিকার প্রবন্ধ পড়ছিলেন। যত পড়ছিলেন, তত তাঁর মুখটা প্যাঁচার মতো গম্ভীর হয়ে যাচ্ছিল।

ম্যাজিষ্ট্রেট ফ্যাঙ্গ বড় রগচটা মানুষ। বিচারের সময় তিনি আইন কানুনের বড় একটা ধার ধারেন না। আইন তিনি নিজেই অনেক সময় তৈরী করে নেন। এজন্য অধিকাংশ সময় তাঁর বিচার বড় অদ্ভুত হয়ে পড়ে।

কয়েকটি সংবাদপত্র তাঁর অদ্ভুত বিচার পদ্ধতি নিয়ে কড়া কড়া সমালোচনা প্রকাশ করে। ম্যাজিষ্ট্রেট ফ্যাঙ্গ এ সব প্রবন্ধ দেখে ক্ষেপে যান। তাঁর মেজাজ যায় বিগড়ে।

এদিন সকালের খবরের কাগজে ফ্যাঙ্গের বিচার পদ্ধতি নিয়ে তীব্র সমালোচনামূলক একটা প্রবন্ধ লেখা হয়েছিল। এতে বলা হয়েছিল, ফ্যাঙ্গ ম্যাজিষ্ট্রেট হবার উপযুক্ত নন। তাঁর বিরুদ্ধে এই নিয়ে তিনশোবার অভিযোগ পেশ করা হল মন্ত্রীর কাছে।

এই প্রবন্ধ পড়ে ম্যাজিষ্ট্রেট ফ্যাঙ্গ রেগে বোম হয়ে ছিলেন।

পুলিশ অলিভারকে টানতে টানতে নিয়ে এসে ফ্যাঙ্গের সামনে দাঁড় করিয়ে দিল। পিছন পিছন এসে দাঁড়ালেন সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক।

ম্যাজিষ্ট্রেট সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোকের দিকে বিষদৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, আজকাল ভদ্রলোকেরাও অনেক অপরাধ করে দেখছি। পুলিস তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বলল, না হুজুর, এই ভদ্রলোক

অপরাধ করেননি। অপরাধ করেছে এই ছেলেটা।

প্রথমেই এই ভুল হওয়ায় ম্যাজিষ্ট্রেট ফ্যাঙ্গের মেজাজ আরও বিগড়ে গেল।

তিনি বললেন, ও একই কথা। ছেলের অপরাধ করাও যা বাবার অপরাধ করাও তাই। বাবারই তো দায়িত্ব ছেলেকে সামলে রাখা। তা এই ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে অভিযোগটা কি—

পুলিশ বলল, না হুজুর, অভিযোগ এই ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে নয়, অভিযোগ এই ছেলেটার বিরুদ্ধে।

বারবার বাধা পেয়ে ম্যাজিষ্ট্রেট ফ্যাঙ্গের মেজাজ আরও খাট্টা। তিনি দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বললেন, এই ভদ্রলোকটা এমন গণ্যমান্য কে যার বিরুদ্ধে অভিযোগ হতে পারে না ?

বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি তাঁর নাম লেখা কার্ডখানা ম্যাজিষ্ট্রেটের সামনে রেখে বললেন. আমার নাম মিষ্টার ব্রাউনলো।

ম্যাজিষ্ট্রেট ফ্যাঙ্গ কার্ডখানার দিকে তাকিয়েও দেখলেন না। হাতের খবরের কাগজ দিয়ে কার্ডখানা ঠেলে দিলেন।

এবার মিষ্টার ব্রাউনলো গেলেন চটে। তিনি সমাজের একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি।

তিনি রেগে গিয়ে বললেন, আমার নাম তো বললাম। কিন্তু এবার ম্যাজিষ্ট্রেট মশাই-এর নামটা জানতে পারি কি ? ম্যাজিষ্ট্রেট ফ্যাঙ্গ বললেন, আমার নাম জানার আপনার কোন প্রয়োজন নেই।

মিষ্টার ব্রাউনলো বললেন, নিশ্চয় প্রয়োজন আছে। যে ম্যাজিষ্ট্রেট অকারণে একজন গণ্যমান্য মানুষকে অপমান করতে পারে তার নাম জানার প্রয়োজন আছে বৈকি।

ম্যাজিষ্ট্রেট ফ্যাঙ্গ এবার একটু ঘাবড়ে গেলেন। এ লোকটা আবার কে। খবরের কাগজের লোক টোক নয় তো ! তিনি এবার একটু গম্ভীর হলেন।

পুলিশের দিকে তাকিয়ে বললেন, এবার কি ঘটেছে বলো। পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে সব ঘটনা খুলে বলল।

ম্যাজিষ্ট্রেট ব্রাউনলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, এ ছেলেটি আপনার পকেট থেকে কি সরিয়েছে ?

ব্রাউনলো বললেন, কিছু সরায়নি তো ? তবে একখানা রুমাল ছিল বটে পকেটে—

—আপনার কি মনে হয়, রুমালটি ওই সরিয়েছে ?

—তা আমি বলতে পারি না।

—এ ছেলেটিকে তো পুলিশ চোর বলেই ধরেছে।

—ধরেছে কেন পুলিশকে জিজ্ঞাসা করুন।

ম্যাজিষ্ট্রেট ফ্যাঙ্গ এবার পুলিশের দিকে তাকিয়ে বলেন, তুমি তো এই 'টম হোয়াইট'কে চুরি করতে দেখেছো ?

—'টম হোয়াইট' কে হুজুর ?

—এই ছেলেটির নাম 'টম হোয়াইট'। ম্যাজিষ্ট্রেট গম্ভীর মুখে বললেন।

পুলিশ আর ম্যাজিষ্ট্রেটকে ঘাঁটাতে সাহস পেল না। কেননা সে তো নিজেও জানে না অলিভারের নাম।

সে বলল, হুজুর, রাস্তার লোকে এই টম হোয়াইটকে চুরি করতে দেখেছে।

—দেখেছে তো ? ব্যস। তিন মাস জেল। 'টম হোয়াইট'-কে জেলে নিয়ে যাও।

পুলিশ অলিভারের হাত ধরে জেলে নিয়ে যাবার জন্যে টান দিল। সেই সময় সেখানে ঢুকল সেই বই-এর দোকানদার যার দোকানের সামনে এই ব্যাপারটি ঘটে গেছে।

দোকানদার ম্যাজিষ্ট্রেটকে বলল, হুজুর, আমার কিছু বলবার আছে।

ম্যাজিষ্ট্রেট ফ্যাঙ্গ ভ্রূ কুঁচকে বললেন, আপনি কে ?

—আজ্ঞে, আমি হচ্ছি সেই দোকানদার যার দোকানের সামনে সমস্ত ঘটনা ঘটেছে।

—আপনার কি বলবার আছে ?

—আজ্ঞে হুজুর, আমি দেখেছি, এই ছেলেটি এই ভদ্রলোকের পকেট থেকে রুমাল সরায় নি।

—এ ছেলেটি সরায়নি তো কে সরিয়েছে?

—আর একটি ছেলে ছিল সেই সরিয়েছে। আমি দোকানে বসে সবদিকে লক্ষ্য রাখি কিনা। তাই সব কিছু দেখতে পেয়েছিলাম।

—দেখতে পেয়েছিলেন তো আগে জানান নি কেন!

—কাকে জানাবো হুজুর? এ ভদ্রলোক চোর চোর বলে চেঁচাতে লাগলেন। রাস্তার লোকজন ছুটতে লাগল। আমার দোকান ফেলে আমি যাই কি করে?

—এখন এলেন কি করে?

—একজনকে দোকানে বসিয়ে তবে এলাম।

—আমার বিচার হয়ে গেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট ফ্যাঙ্গ কটমট করে তাকিয়ে বললেন, এখন আর আমি অন্য রকম বিচার করতে পারি না।

দোকানদার বিনীতভাবে বলল, হুজুর, নিরপরাধ ছেলে জেলে যাবে, সেটা কি ঠিক হবে?

ম্যাজিষ্ট্রেট ফ্যাঙ্গ খাপ্পা হয়ে বললেন, এ তো ভারী ফ্যাচাং হল দেখছি।

অলিভার এতক্ষণ কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েছিল। তার উপর দিয়ে অনেক ধকল গেছে। এবার সে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল নীচে।

ম্যাজিষ্ট্রেট ফ্যাঙ্গ এবার একটু ভয় পেলেন। ছেলেটি নিরপরাধ। তার উপর যদি মরে টরে যায়। তাহলে তো খবরের কাগজগুলো আবার হৈ চৈ করে উঠবে।

তিনি বললেন, আচ্ছা ঝামেলায় পড়া গেল দেখছি।

দোকানদার বলল, হুজুরের কাছে ন্যায় বিচার আশা করি।

ম্যাজিষ্ট্রেট ফ্যাঙ্গ গোলগোল চোখে তাকিয়ে বললেন, বেকসুর খালাস।

এই বলে তিনি উঠে গট গট করে নিজের চেম্বারে ঢুকে পড়লেন।

ব্রাউনলো অলিভারের অজ্ঞান শরীরটা তুলে নিয়ে বললেন, আমি একে আমার বাড়ি নিয়ে যেতে চাই।

দোকানদার বলল, অতি উত্তম কথা। আমি আপনাকে সাহায্য করছি।

দুজনে ধরাধরি করে অলিভারকে বাইরে এনে একটা গাড়ীতে তুললেন।

মিষ্টার ব্রাউনলো বললেন, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। এবার চলি।

—যাবার আগে আমার বইয়ের দামটা দিয়ে যান। দোকানদার বলল, বইটা তো পড়তে পড়তে আপনি পকেটে ঢুকিয়ে ফেলেছেন।

—ওঃ। আমি সত্যি লজ্জিত। মিষ্টার ব্রাউনলো টাকা বের করে দোকানদারকে দিয়ে অলিভারকে নিয়ে চলে গেলেন।

## ॥ ও ফটো কার ? ॥

মিষ্টার ব্রাউনলো অলিভারকে তাঁর বাড়িতে রেখে তার সেবা শুশ্রূষার ব্যবস্থা করলেন।

মিসেস বেডুয়িন তার দেখাশোনা করেন। অলিভার কদিন জ্বরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছিল।

একটু সুস্থ হতে সে নতুন বাড়িঘর দেখে চমকে উঠল। পরিষ্কার বিছানা। মাথার কাছে চেয়ারে বসে আছেন একজন মহিলা যার মুখখানিতে কোমলতা মাখানো।

অলিভার মাথা উঁচু করে বলল, আমি কোথায় এলাম। আমি তো এ ঘর চিনি না।

মিসেস বেড়ুয়িন তাড়াতাড়ি তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে

বললেন, কথা কয়ো না বাছা। কথা কইলে তুমি কিন্তু আবার অসুস্থ হয়ে পড়বে।

অলিভার এত মিষ্টি কথা জীবনে শোনেনি। সে মিসেস বেডুয়িনের হাতখানা ধরে মুখের কাছে এনে ঠোঁট দিয়ে স্পর্শ করে বলল, আপনি খুব ভালো। অনেক ধন্যবাদ।

মিসেস বেডুয়িন বললেন, তুমিও খুব ভালো ছেলে। দাঁড়াও, আমি তোমার জন্যে এক গ্লাস সরবৎ নিয়ে আসি।

মিসেস বেডুয়িন অলিভারের জন্যে এক গ্লাস সরবৎ করে নিয়ে এলেন। অলিভার সেটা খেয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়ল।

তিনদিন পর ডাক্তার এসে অলিভারকে দেখে রায় দিলেন: এবার পুরাপুরি সেরে গেছে। আর কোন ভয় নেই।

ডাক্তারের কথা শুনে মিসেস বেডুয়িনের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।

অলিভার অবাক হয়ে বলল, আপনি কাঁদছেন।

—আমি বাবা আনন্দে কাঁদছি, মিসেস বেডুয়িন বললেন, যা ভয় হয়েছিল। ভগবান রক্ষা করেছেন।

অলিভার বলল, আপনার মতো এত দয়া আমি কারো মধ্যে দেখিনি।

—বাজে বক বক করো না তো বাছা। মিসেস বেডুয়িন বললেন, এবার খেয়ে-দেয়ে একটু তাজা হয়ে নাও। এখনি মিষ্টার ব্রাউনলো তোমাকে দেখতে আসবেন। আমি তোমার জন্যে গরম স্যুপ নিয়ে আসি।

মিসেস বেডুয়িন অলিভারের জন্যে স্যুপ আনতে গেলেন। সেই সময় অলিভারের চোখ পড়ল দেয়ালে টাঙ্গানো একটি বড় ফটোর দিকে।

একটি বিশাল ফ্রেমে বাঁধানো একজন মহিলার ফটো। কি সুন্দর দেখতে মহিলাটি। ফটোখানার দিকে তাকিয়ে অলিভারের বুকের মধ্যে কেমন কেমন করে উঠল।

মিসেস বেডুয়িন স্যুপ নিয়ে ফিরে আসতে সে জিজ্ঞাসা করল, ঐ ফটোখানা কার?

মিসেস বেডুয়িন বললেন, সে আমিও ঠিক বলতে পারব না।

অলিভার বলল, মহিলাটির ফটোটা যেন আশ্চর্য। চোখে কেমন দুঃখের ভাব। মনে হচ্ছে আমার দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে চাইছে। আশ্চর্য তো।

মিষ্টার ব্রাউনলো এই সময় ঘরে ঢুকলেন। অলিভারকে বিছানার উপর উঠে বসতে দেখে তিনি খুব খুশি। বললেন, এই যে মাষ্টার টম. হোয়াইট, তুমি তো বেশ সেরে গেছ দেখছি।

—আমার নাম তো টম হোয়াইট নয়।

—তবে যে ম্যাজিষ্ট্রেট ফ্যাঙ্গ বললেন—

—না-না উনি জানতেন না। আমার নাম অলিভার টুইষ্ট।

মিসেস বেডুয়িন বললেন, অলিভার ওই ফটোখানার কথা জিজ্ঞাসা করছিল।

—কোন্ ফটো?

—ওই যে দেয়ালে ঝোলানো।

মিষ্টার ব্রাউনলো দেয়ালে ঝোলানো ফটোখানার দিকে তাকালেন। পরক্ষণেই অলিভারের মুখের পানে। বিস্ময়ে গোল হয়ে গেল তাঁর চোখ। প্রায় চেঁচিয়ে বললেন, মিসেস বেডুয়িন, এ সব কি ব্যাপার?

—কি ব্যাপার? মিসেস বেডুয়িন অবাক হয়ে বললেন।

—তুমি ওই ফটোর মুখের সঙ্গে অলিভারের মুখের সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছো? দুটো মুখ যেন হুবহু এক। মিসেস বেডুয়িন এবার ফটোখানার দিকে ভাল করে তাকালেন। এবার তাঁর চোখেও বিস্ময়। বললেন, ওমা! তাইতো! কি আশ্চর্য! ফটোর মুখ আর অলিভারের মুখ একদম এক। মনে হয়, ফটোর মুখটা যেন কেটে বসানো। কি ব্যাপার মিষ্টার ব্রাউনলো?

মিষ্টার ব্রাউনলো গম্ভীর হয়ে গেলেন। অলিভার এতক্ষণ ওদের

কথা শুনছিল। ওদের কথা শুনতে শুনতে ওর মনের মধ্যে কেমন গুরগুর করছিল। একটা খুব দুঃখ অথবা আনন্দ। ফটোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তার চোখ ঝাপসা হয়ে এল।

সে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল বিছানার উপর।

## ॥ ফ্যাগিনের ডেয়ার হৈ চৈ ॥

এদিকে ফ্যাগিনের ডেরায় দারুণ হৈ চৈ। জ্যাক আর চার্লি ডেরায় ফিরে এসেছে। অলিভার আসেনি। ফ্যাগিন রেগে টং।

সে চোখ লাল করে জ্যাককে বলল, অলিভার কোথায় বল?

জ্যাক বলল, তাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে।

—পুলিশে ধরে নিয়ে গেল তোরা কি করছিলি?

—আমরা দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম।

—তামাসা দেখছিলি। ফ্যাগিন একটা মদেব বোতল ছুঁড়ে মারল জ্যাকের দিকে। ভাগ্যে জ্যাক সরে গেল। না হলে তার মাথা গুঁড়ো হয়ে যেত।

ঠিক এই সময় সেখানে ঢুকল সাইকস। দেখতে গুণ্ডার মতো। পেছনে এল একটি বিশাল কুকুর। এসেই ফ্যাগিনকে ধমকে বলল, এ সব কি হচ্ছে—এ্যাঁ—বলি হচ্ছেটা কি?

—ছোঁড়াগুলো কথা শোনে না। ফ্যাগিন মিন মিন করে বলল, তাই একটু—

—তাই একটু টাইট দিচ্ছিলাম তাই না? ব্যাটা পাজী বদমাস। আমি হলে তোমাকে কবে খুন করে ফেলতাম। এই ছোঁড়াগুলো ভাল, তাই কিছু বলে না। সাইকস-এর তর্জন-গর্জন শুনে কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করতে লাগল।

সাইকস বলল, মদের বোতল ছুঁড়ে মারা। মদ হল গিয়ে লক্ষ্মী।

আর সেই মদের বোতলের হেনস্তা। ফ্যাগিন তাড়াতাড়ি আর একটা মদের বোতল এনে সাইকস-এর সামনে ধরল।

সাইকস ঢক ঢক করে সবটুকু মদ গলায় ঢেলে একটু শান্ত হল। বলল, ব্যাপারটা কি?

ফ্যাগিন বলল, অলিভার ছোঁড়াটাকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। পুলিশ তো ওর কাছ থেকে আমাদের সব খবর পেয়ে যাবে। তারপর—

সাইকস বলল, তারপর আর কি। পুলিশ এসে তোমাকে দড়ি বেঁধে নিয়ে যাবে।

—এখন উপায়? ফ্যাগিন ভয়ার্ত গলায় বলল।

—পুলিশের হাতে পড়েছে। এখন কোন উপায় নেই।

—তুমি একটা উপায় বাতলে দাও গুরু। ফ্যাগিন সাইকস-এর হাত চেপে ধরল।

—আচ্ছা হাত ছাড় বলছি। সাইকস বলল, তোমার লোক কেউ থানায় গিয়ে ছোঁড়াটার খবর নিয়ে আসুক।

—থানায় কে যাবে। মুখ শুকিয়ে গেল ফ্যাগিনের, থানায় যে যাবে তাকেই তো পুলিশ ধরবে।

—কিন্তু কাউকে তো যেতেই হবে। দাঁত খিঁচিয়ে বলল সাইকস, তোর দলের লোকদের বল না।

ফ্যাগিন দলের সকলকে ডেকে বলল। কিন্তু কেউ রাজী হল না থানায় যেতে। থানায় গেলেই হাজতবাস। মেরে ফেললেও কেউ থানায় যাবে না।

ফ্যাগিন হাঁ করে বসে রইল। সেই সময় সেখানে ঢুকল ন্যানসি আর বেট নামে দুটি মেয়ে। এরাও এদের দলের।

সব কথা শুনে ন্যানসি বলল, ঠিক আছে, আমি থানা থেকে খোঁজ এনে দিচ্ছি।

সে একটা ঝুড়ি আর একটা চাবি নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে থানায় এসে হাজির। দারোগা সাহেবের পায়ের উপর আছড়ে পড়ে বলল,

ওগো দারোগা সাহেব, আমার ভাইকে ফিরিয়ে দাও।

—কে তোমার ভাই? দারোগা চোখ পাকিয়ে বললেন।

—ওই যে গো—সেই ছেলেটা যাকে তোমবা হাজতে পুরেছো।

—আমরা কোন ছেলেকে হাজতে পুরিনি।

—ওই যে গো, যে ছেলেকে চোর বলে ধরেছিলে—

—সেই ছেলেটি চোর নয়। ম্যাজিষ্ট্রেট তাকে ছেড়ে দিয়েছে।

—ছেড়ে দিয়েছে! ন্যানসি দারোগা সাহেবের পায়ে আর একবার আছড়ে পড়ে বলে, শীগ্‌গীর বলো সে কোথায়?

—সে কোথায় তা জানিনা। এক ভদ্রলোক তাকে গাড়ীতে করে নিয়ে গেছেন শুনেছি।

—ভদ্রলোকের নাম ঠিকানা কি?

—অতশত জানিনা। দারোগা সাহেব খেঁকিয়ে উঠলেন, নিজে খোঁজ করে নাও গে। বোধহয় পেন্টনভিলে থাকেন। সেখানেই তো গাড়ী হাঁকাতে হুকুম দিয়েছিলেন ড্রাইভারকে।

ন্যানসি ফ্যাগিনের ডেরায় এসে সব কথা জানাল। ফ্যাগিন হুকুম দিল: যেমন করে হোক, অলিভারকে আবার ধরে আন এখানে।

## ॥ দুই বুড়োর ঝগড়া ॥

দেখতে দেখতে কয়েকদিন কেটে গেল।

অলিভার এখন মোটামুটি সুস্থ হয়ে উঠেছে। ঘবের দেয়ালে সেই ফটোখানা যেন প্রতিমুহূর্তে তাকে চুম্বকের মতো টানে। সে মাঝে মাঝে ওই ফটোখানার কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। ফটোর ওই মহিলার পরিচয় জানার জন্যে তার মন উৎসুক হয়ে থাকে।

এর মধ্যে একদিন সে গেল মিষ্টার ব্রাউনলোর পড়ার ঘরে। যেখানে শুধু বই আর বই। আলমারীতে র‍্যাকে হাজার হাজার বই

সাজানো। এত বই দেখে অলিভার হতবাক। মানুষ এত বইও পড়ে।

অলিভার অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, আপনি এত সব বই পড়েছেন! কি করে পড়লেন?

মিষ্টার ব্রাউনলো মৃদু হেসে বললেন, বড় হলে তুমিও পড়বে বাবা। দেখবে বই পড়ার মতো আনন্দ আর কিছুতে নেই। বই পড়তে পডতে বই লিখতেও শিখবে।

অলিভার বলল, আমার বই লিখতে ভালো লাগে না।

মিষ্টার ব্রাউনলো বললেন, বই লিখতে ভালো লাগে না তো তোমার কি ভালো লাগে?

অলিভার বলল, আমার বই পড়তে ভালো লাগে।

মিষ্টার ব্রাউনলো হো হো করে হেসে উঠলেন।

হাসতে হাসতে বললেন, আর কি ভালো লাগে বলো তো? অলিভার বলল, আমার ইচ্ছে করে চারধারে অনেক বইয়ের মধ্যে আমি বসে থাকবো। বই পড়বো আর বিক্রি করবো।

মিষ্টার ব্রাউনলো বললেন, বাঃ। বেশ ব্যবসা বুদ্ধি তো তোমার। রথ দেখা আর কলা বেচা। যাকগে শোন, তোমাকে আমি কয়েকটা কথা বলতে চাই এবার।

বলতে বলতে মিষ্টার ব্রাউনলো গম্ভীর হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ।

অলিভার মিষ্টার ব্রাউনলোর গম্ভীর মুখ দেখে কিছুটা ঘাবড়ে গেল।

মিনতি করে বলল, আপনার এখানে দয়া করে আমাকে থাকতে দিন স্যার। আমাকে তাড়িয়ে দেবেন না।

মিষ্টার ব্রাউনলো বললেন, না-না, তোমাকে তাড়িয়ে দেব কেন? অন্যায় করলে অবশ্য আলাদা কথা—

অলিভার বলল, আমি কোন অন্যায় কাজ করবো না স্যার। মিষ্টার ব্রাউনলো বললেন, তোমাকে দেখে মনে হয়, তুমি কখনো

অন্যায় কাজ করবে না। কিন্তু তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি বাবা, তুমি ওই সব পকেটমারদের খপ্পরে পড়লে কি করে?

—সে অনেক দুঃখের কথা স্যার, আপনি শুনবেন? অলিভারের চোখে জল চিক চিক করতে লাগল।

—নিশ্চয় শুনবো। মিষ্টার ব্রাউনলো বললেন, তোমার কথা শুনবার জন্যেই তো তোমাকে এখানে ডেকেছি।

এই সময়ে লাঠি ঠক ঠক করতে করতে মিষ্টার গ্রীণউইগ ঘরে ঢুকলেন। তাঁর একটি পা খোঁড়া। শোনা যায়, পথের উপর কমলালেবুর খোসা পড়েছিল। সেই খোসায় পা পিছলে পায়ে আঘাত পেয়ে পা টা-খোঁড়া হয়ে গেছে।

মিষ্টার গ্রীণউইগ ব্রাউনলোর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দুজনে যেমন ভাব তেমন ঝগড়া। মিষ্টার ব্রাউনলো যা বলবেন, গ্রীণউইগ তার প্রতিবাদ করবেনই। এটা স্বভাব।

মিষ্টার গ্রীণউইগ এ বাড়িতে পা দিয়ে একটা কলার খোসা পড়ে থাকতে দেখে বেজায় চটে গিয়েছিলেন। সেই কলার খোসাটা হাতে নিয়েই তিনি ব্রাউনলোর পড়ার ঘরে ঢুকে চেঁচিয়ে বললেন, বলি মতলবটা কি তোমার? একটা কলার খোসায় একটা ঠ্যাং গেছে আর একটা খোসা ফেলে রেখেছো কি আর একটা ঠ্যাং নেবার জন্যে।

মিষ্টার ব্রাউনলো বললেন, মাথা ঠাণ্ডা করে বসো। চা আসছে এখুনি।

মিষ্টার গ্রীণউইগ লাঠিটা একপাশে রেখে চেয়ারে বসলেন। সেই সময় তাঁর নজর পড়ল অলিভারের দিকে। বললেন,

—এ ছোকরাটা আবার কে?

—এর নাম অলিভার টুইষ্ট। এর কথাই তোমাকে বলেছিলাম।

—তাহলে এ ছোকরাটাই বাইরে কলার খোসা ফেলে রেখেছিল।

—না না, এ ফেলবে কেন? ব্রাউনলো হাসতে হাসতে বললেন, তুমি দয়া করে এবার হাত থেকে ওটা ফেলে দাও।

অলিভার তাড়াতাড়ি ওটা তার হাত থেকে নিয়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিল।

মিষ্টার ব্রাউনলো ফিসফিস করে প্রশংসার সুরে বললেন, দেখলে তো। ছেলেটা কত ভদ্র।

মিষ্টার গ্রীণউইগ বললেন, ওসব তোমাকে দেখাবার জন্যে। শুনেছিলাম এর অসুখ হয়েছিল। তা ওহে ছোকরা, এখন কেমন আছো ?

অলিভার বিনীতভাবে বলল, এখন ভালোই আছি।

মিষ্টার গ্রীণউইগ বললেন, তোমার কি আর বেশীদিন এসব জায়গা ভালো লাগবে।

গ্রীণউইগের এসব কথাবার্তা ব্রাউনলোর ভালো লাগছিল না। তিনি অলিভারকে বললেন, যাও তো অলিভার, ভিতরে গিয়ে কাজের লোককে তাড়াতাড়ি চা পাঠিয়ে দিতে বলো।

অলিভার চলে যেতে ব্রাউনলো বললেন, ছেলেটি বেশ দেখতে তাই না ?

গ্রীণউইগ বললেন, দেখতে তো ভালো, কিন্তু শুনতে তো ভালো নয়। এর ইতিহাসটা ভাল করে জেনেছো ?

—সে আমি ঠিক জেনে নেবো।

অলিভার এই সময় ঢুকে বলল, চা এখনি আসছে স্যার।

—ঠিক আছে, তুমি এখন যাও। কাল বেলা দশটায় একবার এসো।

—নিশ্চয় আসবো স্যার।

অলিভার চলে গেল।

মিষ্টার গ্রীণউইগ বললেন, ও আর এসেছে।

মিষ্টার ব্রাউনলো বললেন, তার মানে ? তুমি কি বলতে চাও ও পালিয়ে যাবে ?

গ্রীণউইগ বললেন, আমি বলতে চাই, ও ছোঁড়া আর আসবে না। ও তোমাকে ধোঁকা দিয়েছে।

—কখনো ও ধোঁকা দেয়নি। আমার জীবন বাজি রাখছি।

—আমি বাজি রাখছি আমার মাথা।

—ঠিক আছে। দেখা যাক। কে বাজি জেতে।

এক সময় মিসেস বেডুয়িন এক প্যাকেট বই এনে বললেন, স্যার, দোকান থেকে এই বইগুলো পাঠিয়ে দিয়েছে।

ব্রাউনলো বইগুলো গুণে দেখতে দেখতে বললেন,

—কে এনেছে বইগুলো ? একটু দাঁড়াতে বলো। দামটা দিয়ে দিচ্ছি।

—দোকানের একটি ছেলে বইগুলো নিয়ে এসেছিল। সে তো চলে গেছে স্যার।

—কি মুস্কিল! দামটা দেওয়া হল না। সেদিন একবার ওই কাণ্ড ঘটে গেল। আর তাছাড়া কতকগুলি বই ফেরত দিতে হবে।

—দোকানের ছেলেটা চলে গেছে স্যার। তবে অলিভার ভিতরে আছে।

—তাহলে অলিভারকে দিয়েই দামটা আর বইগুলো পাঠিয়ে দাও না। মিষ্টার গ্রীণউইগ বললেন।

—ঠিক আছে। তাই দেব। মিসেস বেডুয়িন, তুমি অলিভারকে এখানে পাঠিয়ে দাও তো।

—এখুনি দিচ্ছি স্যার।

মিসেস বেডুয়িন ভিতরে গিয়ে অলিভারকে পাঠিয়ে দিলেন।

মিষ্টার ব্রাউনলো তার হাতে পাঁচ পাউণ্ড দিয়ে বললেন, অলিভার তুমি এই দোকানটায় গিয়ে এই বিল অনুযায়ী সাড়ে চার পাউণ্ড দিয়ে দিও। আর এই বইগুলো ফেরত দিয়ে দিও। দশ শিলিং ফেরত নিয়ে এসো। পারবে তো?

—নিশ্চয় পারবো স্যার।

—তুমি আবার এখানেই চলে এসো। কেমন ?

—আসবো স্যার।

অলিভার পাঁচ পাউণ্ডের নোট আর বইগুলো ফেরত নিয়ে চলে গেল।

—দেখো কিছুক্ষণের মধ্যেই অলিভার ফিরে আসবে। মিষ্টার ব্রাউনলো টেবিলের উপর ঘড়িটা রেখে বললেন, বড় জোর বিশ মিনিট।

—বিশ মিনিট কেন, বিশ দিনেও আসে কিনা ছাখো। পাঁচ পাউণ্ড হাতে পেয়েছে। ও এখন সোজা গিয়ে উঠবে ওর পুরোনো বন্ধুদের ডেরায়।

—তোমার মাথা। ঘড়ির কাঁটার দিকে চোখ রেখে বসে থাকো। তাহলেই বুঝতে পারবে ও কখন ফেরে।

দুই বন্ধু ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন।

## ॥ আবার ফ্যাগিনের কবলে ॥

অলিভার পাঁচ পাউণ্ডের নোট আর বইয়ের প্যাকেট নিয়ে রাস্তা দিয়ে হাঁটছে। মনে বেশ স্ফূর্তি। মিষ্টার ব্রাউনলো এত ভালো মানুষ। তার একটা উপকার করতে পারা যাচ্ছে। এতেই অলিভার খুশি।

বেশ কিছুটা পথ চলে গেল অলিভার। হঠাৎ একটি যুবতী মেয়ে কোথা থেকে ছুটতে ছুটতে এসে অলিভারের হাত চেপে ধরল। চেঁচিয়ে বলল, অলিভার ভাই আমার, তুই কোথায় ছিলি এতদিন।

অলিভার বিরক্ত হয়ে হাত ছাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করল, ছাড়ো ছাড়ো ছাড়ো। ছেড়ে দাও। আমার কাজ আছে। আমি তোমার ভাই না।

—তুই আমার ভাই নোস্। মেয়েটি আরও জোরে অলিভারের হাত চেপে ধরে কেঁদে কেঁদে বললে, এ কি কথা বলছিস রে তুই। তুই তো একেবারে গোল্লায় গেছিস।

মেয়েটির চিৎকার শুনে চারদিকে ভিড় জমে গেল। নানা মানুষ নানা মন্তব্য করতে লাগল।

একজন গুণ্ডা চেহারার লোক বলল, কি হয়েছে ?

মেয়েটি বলল, এ আমার ভাই। কদিন হল বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে। আজ দেখতে পেয়ে ধরেছি।

গুণ্ডা চেহারার লোকটা বলল, এই ছেলে, ভালো চাও তো দিদির সাথে বাড়ি ফিরে যাও।

অলিভার বলল, বারে। আমার কোন দিদি-টিদি নেই।

মেয়েটি বলল, ভালো করে ছাখ তো. তুই আমাকে চিনিস কিনা। অলিভার এবার ভালো করে মেয়েটির মুখের দিকে তাকাল। তাকিয়ে চমকে উঠল। এতক্ষণ খেয়াল করেনি। এ যে সেই ফ্যাগিনের ডেরার ন্যানসি।

অলিভার চমকে বলল, তুমি ন্যানসি।

ন্যানসি এবার হেসে বলল, দেখলি তো, আমি তোর দিদি ন্যানসি। তারপর ভিড়ের মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে বলল, আপনারা দেখলেন তো, এ আমার ভাই কিনা।

ভিড়ের মধ্যে থেকে একজন বলল, এ্যাই খোকা, দিদির সাথে বাড়ি চলে যা।

অলিভার বলল, না—আমার কোন বাড়ি নেই।

ন্যানসি গালে হাত দিয়ে বলল, ওমা, তুই কি বলছিস রে। তোর বাড়ী আছে, বাড়িতে মা তোর জন্যে কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গেল। লক্ষ্মী ভাইটি বাড়ি চল।

—না, আমি যাবো না।

গুণ্ডা চেহারার লোকটি সামনে এসে বলল, এ এমনি যাবে না,- একে একটু দাওয়াই দিতে হবে। এই বলে সে অলিভারের হাত থেকে বইয়ের প্যাকেটটা কেড়ে নিল। তারপর তাই দিয়ে তার মাথায় খুব জোরে একটা আঘাত করল। সঙ্গে সঙ্গে গালে এক চড়।

অলিভার ঘুরে পড়ে যাচ্ছিল।

গুণ্ডা চেহারার লোকটি ন্যানসিকে বলল, তুমি শক্ত করে ওর ওই হাতটা ধরে থাক। আমি এ হাতটা ধরছি।

অলিভারকে ওরা টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলল ফ্যাগিনের ডেরায়।

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা হাজির হল ডেরায়।

ডেরায় সকলেই হাজির।

ওদের দেখে সকলে হৈ চৈ করে উঠল।

চার্লি নাচতে নাচতে বলল, ওরে, আমাদের হারানো মানিক আবার ফিরে এসেছে রে। কি মজা। কি মজা।

জ্যাক ওর পকেটগুলো হাতড়াতে হাতড়াতে বলল, দেখি দেখি কি মালকড়ি এনেছে।

চার্লি বলল, আরেব্বাস। কি দারুণ জামা-প্যান্ট পরেছে ছাখ। একেবারে বড়লোক হয়ে গেছে।

ফ্যাগিন এসে অলিভারকে একটা সেলাম করে বলল, সেলাম হুজুর, তোমার এত উন্নতি হয়েছে দেখে আমি বেজায় খুশি। তা তোমার দামী জামা প্যান্ট তো এখানে চলবে না। ওগুলো খুলে ফ্যালো। আমি তোমাকে আমাদের পোশাক দিচ্ছি।

এই সময় জ্যাক ওর ভিতরের পকেট থেকে পাঁচ পাউণ্ডের নোটটা বের করে বলল, কেল্লা ফতে। আমি এটা পেয়ে গেছি।

ফ্যাগিন এসে ছোঁ মেরে নোটটা ছিনিয়ে নিয়ে বলল, এ টাকা আমার।

সেই গুণ্ডা চেহারার লোকটা বলল, খবরদার, আমি ছোঁড়াটাকে নিয়ে এসেছি। এ টাকা আমার।

বলতে বলতে সে ছোঁ মেরে ফ্যাগিনের কাছ থেকে টাকাটা নিয়ে নিল।

অলিভার এতক্ষণ হাঁ করে সব দেখছিল আর শুনছিল। এবার ও মিনতি করে বলল, ও টাকা তোমরা নিও না। ও টাকা সেই বুড়ো ভদ্রলোকের। তিনি আমাকে বাঁচিয়েছেন। এই টাকা আর বই তাকে ফেরত পাঠিয়ে দাও।

—ইঃ। ইয়ার্কি। টাকা বুড়োকে ফেরত পাঠিয়ে দাও। মামা বাড়ির আবদার।

—টাকা না দাও আমাকে ছেড়ে দাও তোমরা। সেই বুড়ো ভদ্রলোক আমাকে চোর ভাববেন। আমি তার সাথে একবার দেখা করে আবার চলে আসবো। আমাকে ছেড়ে দাও।

—ছেড়ে দিচ্ছি তোকে। ফ্যাগিন মুখ বিকৃত করে বলল, চুপ করে বসে থাক এখানে।

এই বলে ফ্যাগিন সেই গুণ্ডা লোকটার সঙ্গে কথা বলার জন্যে মুখ ঘোরাল। আর সঙ্গে সঙ্গে অলিভার এক ছুট লাগাল। কিন্তু যাবে কোথায়।

গুণ্ডা লোকটি দৌড়ে গিয়ে তার ঘাড় ধরে নিয়ে এসে আছড়ে ফেলল।

অলিভারকে আবার আটকে ফেলা হল ফ্যাগিনের ডেরায়।

## ॥ নিরুদ্দেশ! নিরুদ্দেশ! ॥

এদিকে অলিভার ফিরে না আসায় মিষ্টার ব্রাউনলো খুব চিন্তিত হয়ে পড়লেন। কারণ তাঁর মনে স্থির বিশ্বাস জন্মেছিল ছেলেটা অত্যন্ত ভালো। কোনভাবে সে বাজে দলের খপ্পরে গিয়ে পড়েছিল। হয়তো আবার তাদের খপ্পরেই পড়েছে।

মিষ্টার গ্রীণউইগ তো দারুণ খুশি। তাঁর ধারণা, অলিভার সেই পাঁচ পাউণ্ড হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়েছে। তিনি উঠতে বসতে ব্রাউনলোকে খোঁটা দেন, কি হে, কেমন হল? কোথায় গেল তোমার ভালো ছেলে?

ব্রাউনলো মুখের মতো জবাব দেন, কোথায় গেল সময় হলে জানতে পারবে। সে এসে তোমার থোঁতা মুখ ভোঁতা করে দেবে।

—আচ্ছা আচ্ছা আমিও দেখবো। মিষ্টার গ্রীণউইগ খুশির চোটে কয়েক কাপ চা বেশী খেয়ে ফেলেন।

ব্রাউনলো ক'দিন এদিক ওদিক অলিভারের খোঁজ করলেন। খোঁজ না পেয়ে তিনি খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলেন।

## ॥ নিরুদ্দেশ ! পাঁচ গিনি পুরস্কার ! ॥

"এতদ্দ্বারা সকলকে জানানো যাচ্ছে, অলিভার টুইষ্ট নামে একটি বালক নিরুদ্দেশ হয়েছে। কেউ তার খোঁজ দিতে পারলে কিংবা পূর্ব ইতিহাস জানালে পাঁচ গিনি পুরস্কার পাবে।"

মিষ্টার বাম্বল তাঁর অনাথ আশ্রমে বসে এই বিজ্ঞাপন পড়ে খুশি। পাঁচটা গিনি তো বড় কথা নয়। অলিভারের পূর্ব ইতিহাস জানালে পাঁচটা গিনি লাভ।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞাপনের কাটিংটা নিয়ে লণ্ডনের ট্রেনে চড়ে বসলেন।

লণ্ডনের পেণ্টলভিলে মিষ্টার ব্রাউনলোর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে নিজের পরিচয় দিয়ে অলিভারের পূর্ব ইতিহাস জানালেন।

তিনি বললেন, অলিভার রাস্তায় কুড়িয়ে পাওযা ছেলে। ওর কোন পরিচয় নেই। অনাথ আশ্রমে ওকে মানুষ করা হয়েছিল। কিন্তু ওর স্বভাব এত খারাপ ও কারুর সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারল না। ও বেজায় হিংসুটে। অনাথ আশ্রম থেকে পালিয়ে এসে কোথায় কোন চোর গুণ্ডাদের দলে যোগ দিয়েছে।

সব কথা শুনে মিষ্টার ব্রাউনলো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সত্যি। তিনি এতটা আশা করেন নি। ওইটুকু ছেলে। বাইরে কি মধুর স্বভাব। ভিতরে ভিতরে এত ! মিষ্টার বাম্বল তো বাচ্চাকাল থেকে ওকে দেখেছেন। তিনি নিশ্চয় মিথ্যা বলছেন না। ছেলেটা তাহলে জোচ্চোর।

তিনি পাঁচ গিনি দিয়ে মিষ্টার বাম্বলকে বিদায় করলেন।

মনটা তার খারাপ হয়ে রইল। সর্বক্ষণ মনের মধ্যে অলিভারের কথা।

মিসেস বেডুয়িন কিন্তু বাম্বলের কথা মানতে রাজী নন। তিনি

বললেন, লোকটা অনেক বাজে কথা বলেছে। ছেলেটা সত্যি ওরকম নয়।

## ॥ ডাকাতির চেষ্টা ব্যর্থ ॥

অলিভারকে একটা তালাবন্ধ ঘরের মধ্যে আটকে রাখা হয়েছে। তাকে বাইরে বেরোতে দেওয়া হয় না, কারো সঙ্গে কথাও বলতে দেওয়া হয় না। ফ্যাগিন এক এক বার এসে তাকে বোঝায়, এই ডেরার চেয়ে আর ভালো জায়গা নেই। অলিভার তার দলে থাকলে খুব উন্নতি করবে। অনেক টাকা পয়সা পেয়ে বড় লোক হয়ে যাবে।

অলিভার চুপ করে তাঁর কথাবার্তা শোনে। কোন উত্তর দেয় না। দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ কেটে গেল।

ফ্যাগিন ভাবল, তার উপদেশে বেশ কাজ হয়েছে। অলিভার পোষ মেনেছে।

তখন আর তার ঘরে তালা দেওয়া হতো না। তাকে বাড়ির মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়াবার স্বাধীনতা দেওয়া হলো। তবে সব সময় তার উপর চোখ রাখা হতো।

বাড়িখানা বেশ বড়। ভাঙা-চোরা। অনেকগুলো ঘর। নানান ধরনের লোক থাকে এ বাড়িতে।

এখানেই অলিভার একদিন দেখতে পেল চিটলিংকে। চিটলিং সতেরো আঠারো বছরের ছেলে। কিন্তু এর মধ্যেই অনেকবার জেলে গেছে।

সে অলিভারকে শোনাত জেলের গল্প।

একদিন সকালে ফ্যাগিন বলল, অলিভার আজ তোকে সাইকস-এর ডেরায় যেতে হবে।

সাইকস! সেই গুণ্ডা লোকটা। শুনেই তো অলিভারের আক্কেল গুড়ুম।

অলিভার বলল, কেন? সাইকস-এর ডেরায় কেন?

—সাইকস তোকে কি একটা কাজে লাগাবে। তোকে পাঠিয়ে দিতে বলেছে ন্যানসির সাথে।

—আমি সাইকস-এর ওখানে যাবো না।

—ইঃ। যাবো না বললেই সাইকস শুনবে। আমি পর্যন্ত ওকে ভয় করি। ও খুব ঠাণ্ডা মাথায় মানুষ খুন করতে পারে। সাবধান।

—আমাকে ও মেরে ফেলবে।

—মেরে ফেলবে কেন? কথা শুনে চললে কিছু বলবে না। কিন্তু একটু এদিক সেদিক হলেই সোজা পিস্তলের গুলি। এই বলে ফ্যাগিন ন্যানসিকে ডাক দিল, ন্যানসি এদিকে এসো তো। তুমি অলিভারকে সাইকস-এর ডেরায় পৌঁছে দিয়ে এসো।

ন্যানসি এসে দাঁড়ালে ফ্যাগিন তাকে সাবধান করে দিল, খুব সতর্ক থাকবে রাস্তায়। ছোঁড়াটার হাত শক্ত করে চেপে ধরে থাকবে। ছাড়বে না। ও ভীষণ শয়তান ছেলে।

ন্যানসি অলিভারের হাত ধরে বলল, চল ভাই আমার সাথে। কোন ভয় নেই।

ফ্যাগিন আবার চেঁচিয়ে বলল, খবরদার, পালাবার চেষ্টা করবি না। তাহলে সাইকস তোকে শেষ করে ফেলবে।

পথে বেরিয়ে ন্যানসির কেমন মায়া হল অলিভারকে দেখে। এখানে যেসব ছেলেরা আসে, অলিভার তাদের মতো না। একে দেখেই বোঝা যায়, অন্য ধরনের ছেলে। সারা মুখে কোমলতা আর মাধুর্য। ন্যানসির যদি এ রকম ভাই থাকতো, হয়তো এরকমই হতো।

পথে যেতে যেতে ন্যানসি সাহস দিয়ে বলল, সাইকস-এর ওখানে আমি থাকবো। তোর কোন ভয় নেই অলিভার।

অলিভার বলল, সাইকস আমার উপর খুব অত্যাচার করবে।

ন্যানসি বলল, ইস। অত্যাচার করলেই হল! আমি রয়েছি না। সব সময় মনে রাখবি আমি তোর দিদি। তুই জানিস এর আগের দিন তোর হয়ে কথা বলার জন্যে আমার কি হয়েছে?

অলিভার ঘাড় নাড়ল, না আমি জানি না।

—এই ছাখ, আমার গলার কাছটায় ছাখ। ন্যানসি গলা থেকে জামাটা সরিয়ে দেখাল। সেখানে মারের দাগ।

—কে মারল তোমাকে ?

—কে আবার। ওই ফ্যাগিন শয়তানটা। সেদিন তোর পক্ষ নিয়ে কথা বলার জন্যে আমাকে মেরেছিল। দাঁড়া না, আমিও ওদের একদিন জব্দ করবো দেখিস।

কথা বলতে বলতে ওরা সাইকস-এর ডেরায় পৌঁছে গেল। সাইকস বসে মদ খাচ্ছিল। পাশে তার সেই হতচ্ছাড়া বিশাল কুকুর।

ন্যানসির সঙ্গে অলিভারকে আসতে দেখে সাইকস ঠাণ্ডা চোখে তাকাল একবার। তারপর পিস্তল বের করে বলল, এটা কি দেখেছিস ?

অলিভার কোন কথা বলল না।

সাইকস পিস্তলটা নাচাতে নাচাতে বলল, আমার হুকুম ছাড়া এক পা কোথাও নড়েছিস তো স্রেফ একটা গুলি—বুঝেছিস ?

ন্যানসিকে বলল, যা ওকে রাতের খাবার দে। ভোরবেলা ও আমার সাথে বেরোবে।

পরদিন ভোরবেলা সাইকস অলিভারকে সঙ্গে নিয়ে বের হল। গত রাত্রে খুব বৃষ্টি হয়ে গেছে। রাস্তায় জল জমে আছে। এখনও বেশ কনকনে হাওয়া।

সাইকস হাইড পার্ক পার হয়ে বেনসিংটনের পথ ধরল। সেখান থেকে একটা গাড়ীতে উঠে কিছুদূর এসে নামল একটা হোটেলের সামনে। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতে এসে পৌঁছাল হ্যাম্পটন শহরে।

সেখানে একটা ভাঙাচোরা হোটেলে রাতের খাওয়া সেরে অলিভারকে নিয়ে আবার বের হল। একটা গাড়ীতে চেপে সে এসে নামল শোপার টাউনে। জায়গাটা অন্ধকার। রাস্তা খুব খারাপ।

জলকাদায় ভরা। হাঁটতে হাঁটতে সাইকস এবার দাঁড়াল একটা ভাঙাচোরা বাড়ির সামনে।

দরজায় তিনটে টোকা দিতেই দরজা খুলে গেল। সামনে এসে দাঁড়াল টোবি। এও আর একজন গুণ্ডা। ভিতরে টেবিলের ধারে বসে ছিল বার্নি।

সাইকসকে দেখে বলল, আরে, এসো, এসো, তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি।

—সব ঠিকঠাক তো? সাইকস জিজ্ঞাসা করল।

—সব ঠিক। এসো, আগে পান ভোজন করে নেওয়া যাক।

টোবি ওদের একটা টেবিলের ধারে বসাল। মদের বোতল বের হল। ঢক ঢক করে মদ খেতে লাগল ওরা। নেশার ঝোঁকে অলিভারের গলায় জোর করে ঢেলে দিল মদ।

অলিভারের গলা জ্বলতে লাগল। ও যন্ত্রণায় চেঁচিয়ে উঠল। ওরা হাসতে লাগল হ্যা হ্যা করে।

রাত দেড়টা নাগাদ ওরা লুট করতে বের হল। সকলেই কালো চাদরে মুখ গলা ঢেকে নিল। সকলের পকেটে গুলিভরা পিস্তল। অলিভারকে পরিয়ে দিল লম্বা ঢোলা জামা।

রাস্তায় ঘন কুয়াশা। পাশের লোককে দেখা যায় না। রাত দুটো নাগাদ ওরা এসে দাঁড়াল একটা বড় বাগানওয়ালা বাড়ির সামনে। চারপাশে পাঁচিল দেওয়া।

টোবি বেড়ালের মতো পাঁচিলের উপর উঠে ভিতরটা দেখে নিয়ে ইসারা করল, সব ঠিক। চলে এসো। তারপর লাফিয়ে পড়ল বাগানের মধ্যে।

টোবির মতো ওরাও পাঁচিলে উঠে বাগানের মধ্যে লাফিয়ে পড়ল।

ভয়ে অলিভারের শরীর থরথর করে কাঁপছিল। সে বুঝতে পারল, ওরা এই বাড়িতে ডাকাতি করতে যাচ্ছে। ধরা পড়লে জেল।

সে হঠাৎ মাটির উপর শুয়ে পড়ে গোঙাতে লাগল। সাইকস

তার চুল ধরে টেনে তুলে বলল, এ্যাই শুয়োর, শীগগীর ওঠ। নইলে এক্ষুণি তোকে শেষ করে দেবো।

অলিভার কাঁদতে কাঁদতে বলল, আমাকে দয়া করে ছেড়ে দাও।

সাইকস দাঁতে দাঁত চেপে পিস্তলটা বের করে বলল, দাঁড়া, তোকে একেবারেই ছেড়ে দিচ্ছি।

সাইকস পিস্তলের ট্রিগার টানতে যাচ্ছিল, টোবি তাব হাত চেপে ধরল, এখন মাথা গরম করিস না। পিস্তলের শব্দ হলে সব কিছু বানচাল হয়ে যাবে সে খেয়াল আছে ?

সাইকস বলল, এ হারামজাদা বদমাইসি করছে যে।

—এ সব বদমাইসকে শায়েস্তা করবার মন্ত্র আমার জানা আছে। তুই আমার হাতে ছেড়ে দে।

টোবি অলিভারের হাত ধরে হ্যাঁচড়া টান মেরে বলল, এ্যাই, একটা শব্দ করেছিস কি তোর মাথা আমি গুঁড়িয়ে দেবো। মুখ বুঁজে আমার সাথে চল। সাইকস, তুমি জানলাটা খুলে ফ্যাল।

সাইকস বাড়ির পিছন দিকে যেয়ে অদ্ভুত কৌশলে একটা জানালা খুলে ফেলল।

তারপর অলিভারের হাতে একটা ছোট লণ্ঠন তুলে দিয়ে বলল, তুই এটা নিয়ে জানলা দিয়ে ভিতরে ঢুকে যা। ভিতরে গিয়েই দরজা খুলে দিবি।

অলিভার জানলা দিয়ে ভিতরে নেমেই চিৎকার করে উঠল।

সেই চিৎকার শুনে উপরে দুটো মানুষ ছুটে এল। একজন পিস্তল থেকে গুলি ছুঁড়ল। অলিভারের পায়ে গুলি লাগল। সাইকস হ্যাঁচকা টান দিয়ে অলিভারকে আবার জানলা দিয়ে বের করে নিয়ে এল।

উপরে তখন হৈ চৈ শুরু হয়ে গিয়েছে। সাইকস অলিভারকে পিঠে নিয়ে ছুটতে শুরু করল।

তার সঙ্গীরা তার আগেই ভেগে পড়েছে।

## ॥ স্যালী বুড়ির গোপন কথা ॥

মিসেস কর্ণি অনাথ আশ্রমে চাকরী করেন। তাঁর স্বামী মারা গেছে। তিনি এখন একা একাই থাকেন। তিনিও ফাঁক পেলেই অনাথ আশ্রমের টাকা-পয়সা খাবার-দাবার চুরি করেন। এ বিষয়ে মিষ্টার বাম্বলের সঙ্গে তাঁর মিল খুব।

মিষ্টার বাম্বল মাঝে মাঝে তার সাথে গল্প করে যান। মিসেস কর্ণি তাকে জানিয়েছেন, তিনি এর মধ্যে বেশ কিছু টাকা জমিয়ে ফেলেছেন।

সেই টাকা পয়সার লোভে মিষ্টার বাম্বল আবার তাঁকে বিয়ে করার কথা ভাবছেন।

একদিন মিসেস কর্ণি বসে চা খাচ্ছেন। মিষ্টার বাম্বল সামনে বসে বকবক করে যাচ্ছেন। এমন সময় ঝি এসে জানাল, অনাথ আশ্রমের বুড়ি ধাই স্যালির শেষ অবস্থা। সে মারর আগে মিসেস কর্ণিকে একবার দেখতে চায়।

মিসেস কর্ণি বাম্বলকে বসতে বলে ছুটলেন স্যালী বুড়ির ঘরে। অন্ধকার ঘরে নোঙরা বিছানায় বুড়ি শুয়ে ছিল। দেখেই বোঝা যায় বেশীক্ষণ বাঁচবে না। জোরে জোরে শ্বাস ফেলছে। পাশে বসে আছে একজন ছোকরা ডাক্তার। আর একজন বুড়ি।

মিসেস কর্ণিকে দেখে ছোকরা ডাক্তার বলল, আর কিছুক্ষণের মধ্যেই সব মিটে যাবে।

ডাক্তার চলে গেলে মিসেস কর্ণি স্যালী বুড়ির ঘরে বসে রইলেন।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। স্যালী বুড়ি সমানে শ্বাস টেনে যাচ্ছে।

মিসেস কর্ণি বিরক্ত হয়ে বললেন, ধ্যুৎ। আব কতক্ষণ আমাকে এভাবে বসে থাকতে হবে।

অন্য বুড়িটা বলল, বেশীক্ষণ নয়। মৃত্যু তার সময় মতো ঠিকই

আমাদের সকলকেই ডেকে নেবে।

মিসেস কর্ণি খেঁকিয়ে উঠে বললেন, চুপ কর তুমি। আমার এসব বাজে কথা শোনার সময় নেই।

এই বলে তিনি উঠতে যাচ্ছিলেন। স্যালী বুড়ি চোখ বড় বড় করে বলল, তোমার সাথে কিছু গোপন কথা আছে। ওকে যেতে বল।

মিসেস কর্ণি সেই বুড়িকে ঘর থেকে যেতে বললেন। বুড়ি বেরিয়ে যেতে স্যালী চিঁচিঁ করে বলল, শোন মেয়ে, মরার আগে তোমাকে একটা গোপন কথা বলে যাই।

—কি গোপন কথা?

—ওই যে অনেক বছর আগে একটি মেয়ে এখানে এসেছিল না? তার একটি বাচ্চা হয়েছিল।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে আছে। মিসেস কর্ণি বললেন।

—বাচ্চা হবার সময় আমিই তার কাছে ছিলাম। সে আমার কাছে সোনার একটা জিনিস রাখতে দিয়েছিল—বলেছিল যদি তার মৃত্যু হয়—এটা যেন তার ছেলেকে দেওয়া হয়।

—সেই সোনার জিনিসটা কোথায়?

—সোনার জিনিসটা! সোনার জিনিসটা! স্যালী বুড়ি বিড় বিড় করে বকতে বকতে ঘোলাটে চোখে চেয়ে রইল।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—বল সেই সোনার জিনিসটা কোথায়।

স্যালী বুড়ি ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে রইল। ওর শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন হয়ে এল। গলায় ঘড়ঘড় শব্দ হতে লাগল। কয়েকবার ছটফট করে ওর দেহটা স্থির হয়ে গেল।

—ব্যস্। মরবার আর সময় পেল না। বিরক্তিতে কুঁচকে গেল মিসেস কর্ণির ঠোঁট, আর দু মিনিট পরে মরলে যেন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত।

বিরক্তিতে গজ গজ করতে করতে মিসেস কর্ণি ঢুকলেন নিজের ঘরে।

মিষ্টার বাম্বল বললেন, তুমি যে বলছিলে তুমি কিছু টাকা পয়সা জমিয়েছো।

—তা জমিয়েছি কিছু। কেন?

—না, এমনি জিজ্ঞাসা করছি। মানে সংসার চালাবার জন্যে—আচ্ছা তুমি আর কি কি খরচ বাঁচাতে পারো?

—আমার মোমবাতি ও কয়লার খরচ লাগে না। তাছাড়া বাড়ি-ভাড়াও লাগে না। আশ্রমের চাকরীর জন্যেই এই সুবিধাটা পাওয়া যায়।

—তা সুবিধাই বটে। এতেও অনেকটা খরচ বাঁচে। তাহলে বিয়েটা করেই ফেলা যাক—কি বলো।

—তা আপনার যেমন ইচ্ছা। মিসেস কর্ণি লাজুক মুখে বললেন।

—বিয়ের ব্যাপারে খরচাই হচ্ছে আসল কথা। সে খরচ যদি বাঁচে, তাহলে বিশেষ কোন সমস্যাই থাকে না।

—আপাতত একটি সমস্যা থেকে উদ্ধার করুন।

—এখন আবার কিসের সমস্যা? বাম্বল অবাক হয়ে বললেন।

—স্যালী বুড়ি মারা গেছে। তাকে কবর দিতে হবে। আপনি কফিনের ব্যবস্থা করুন।

—বিয়ের কথার সঙ্গে সঙ্গে কফিনের কথা। মিষ্টার বাম্বল একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, ঠিক আছে, তুমি যখন বলছো। যাই একবার সোয়ার বেরীর বাড়িতে। তাকে একটা কফিন পাঠাবার কথা বলে আসি।

মিষ্টার বাম্বল বিরস মুখে চললেন সোয়ার বেরীর বাড়ির উদ্দেশে।

## ॥ অলিভার কোথায়? ॥

এদিকে ফ্যাগিনের ডেরায় ফ্যাগিন খুব চিন্তার মধ্যে আছে। খবরের কাগজে সাইকস-এর ডাকাতির খবর বের হয়েছে। আর সে

ডাকাতি যে ব্যর্থ হয়েছে, সে খবরও বেরিয়েছে। পুলিশ ওদের ধরবার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছে। ধরতে পারলে সব খবরই তো ফাঁস হয়ে যাবে।

এই সব কথা ভেবে ফ্যাগিনের চোখে ঘুম নেই। ডেরায় বসে ও মদ খাচ্ছিল। জ্যাক, চার্লস বেটন আর চিটলিং বসে বসে তাস খেলছিল।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে।

এমন সময় মুখ গলা চাদরে ঢেকে সেখানে ঢুকল টোবি। এক মুখ দাড়ি। রুক্ষ চেহারা। ঘরে ঢুকেই মুখের চাদর সরিয়ে ফেলল।

ফ্যাগিন অবাক হয়ে বলল, টোবি তুমি?

টোবি রুক্ষ গলায় বলল, আগে কিছু খেতে দাও। পুলিশের তাড়া খেতে খেতে জান গেল।

ফ্যাগিন টোবির সামনে কিছু খাবার রাখল। গোগ্রাসে খেতে লাগল টোবি। খেয়ে দেয়ে একটু সুস্থ হয়ে বলল, সাইকস কোথায়? আর সেই ছেলেটা?

ফ্যাগিন বলল, তাদের খবর তো তুমিই দেবে। আমি তো খবর পাবার আশায় বসে আছি।

—আমি ওদের খবর কিছুই জানি না। টোবি ভাঙা গলায় বলল, সেদিন আমাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে।

—তা তো খবরের কাগজে পড়েছি। ব্যাপারটা কি হল?

—আমরা অনেকটা এগিয়েছিলাম। বাড়ির লোকজন উঠে গুলি ছুঁড়ল। সাইকস ছোঁড়াটাকে নিয়ে ছুটতে শুরু করলো।

—তারপর? ফ্যাগিন উত্তেজনায় মদ খেতে ভুলে গেল।

—ছোঁড়াটার পায়ে বোধ হয় গুলি লেগেছিল। ওদিকে বাড়ির লোকজন তাড়া করেছিল। সাইকস শেষ পর্যন্ত ছোঁড়াটাকে এক খানার মধ্যে ফেলে কোথায় পালিয়ে গেল। ছোঁড়াটা বেঁচে আছে কি মরে গেছে কে জানে!

—সাইকস-এর ডেরায় গিয়েছিলে ?

—না। সেখানে যাবার সাহস নেই। পুলিশ ধরতে পারলে ছিঁড়ে খাবে।

—সাইকসকে খুঁজে বের করতেই হবে। ফ্যাগিন বলল, আমি এখনি যাচ্ছি ওর ডেরায়।

এই বলে ফ্যাগিন লাফিয়ে উঠে ছুটে বাইরে বেরিয়ে গেল। একটা গাড়ী ভাড়া করে পৌছে গেল. সাইকস্-এর ডেরায়। ভিতরে ঢুকে গ্যাখে, ন্যান্‌সি মুখ শুকনো করে বসে আছে।

ফ্যাগিনকে দেখে দৌড়ে এল, বিলের খবর কি ?

—এখানে আসেনি ?

—না। তার কোন পাত্তা নেই। তুমি কিছু জান তার খবর ?

—কিছুই জানি না। টোবি এসেছিল। তার মুখে যেটুকু শুনেছি।

—কি শুনেছো বলো।

ফ্যাগিন তখন সব কথা খুলে বলল। সব শুনে ন্যান্‌সি চিন্তিত মুখে বসে রইল।

ফ্যাগিন বলল, সে হতভাগা ছোঁড়াটার কি হলো কে জানে। খানার মধ্যে ফেলে দেওয়া হয়েছে শুনলাম, ও কি আর বাঁচবে ?

ন্যানসি বলল, নিশ্চয় বাঁচবে। আমাদের সঙ্গে থাকলে যেভাবে বাঁচতো, তার চেয়ে ভালোই বাঁচবে।

ফ্যাগিন গোমড়া মুখে বলল, আমি যাচ্ছি। সাইকস এলে সঙ্গে সঙ্গে খবর দিও।

এই বলে সে আবার নিজের ডেরার দিকে পা বাড়াল।

## ॥ মিসেস সেইলির বাড়িতে ॥

অলিভারকে নিয়ে সাইকস যে বাড়িটায় ডাকাতি করতে

এসেছিল, সে বাড়ির মালিক মিসেস সেইলি। তার প্রচুর ধনসম্পত্তি। বাড়িতে থাকার মধ্যে আছে তার ভাইঝি মিস রোজ। আর একগাদা চাকর-বাকর বাবুর্চি বেয়ারা।

বাবুর্চির নাম হল জাইলস আর বেয়ারার নাম ব্রিটলস। তুজনেই এ বাড়িতে অনেকদিন ধরে আছে। ওদেরই একজন গুলি ছুঁড়েছিল।

এ বাড়িটার কিছু দূরে একটা খানার মধ্যে অলিভারকে ফেলে দিয়েছিল সাইকস্।

অনেকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সে। তারপর ঠাণ্ডা হাওয়ায় আস্তে আস্তে তার জ্ঞান ফিরে এল। সে কোন মতে উঠবার চেষ্টা করতেই পায়ের যন্ত্রণায় চিৎকার করে আবার বসে পড়ল।

পায়ে অসম্ভব কষ্ট। অলিভার বুঝতে পারল, এভাবে আর কিছুক্ষণ থাকলে তাকে এমনিতেই মরতে হবে। যত কষ্টই হোক, এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে।

দাঁতে দাঁত চেপে সে কোন মতে উঠে দাঁড়াল। সমস্ত শরীর টলছে, তবু সে পা টেনে টেনে হাঁটতে লাগল। হাঁটতে হাঁটতে সেই বাগানওয়ালা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়িটা দেখেই সে বুঝতে পারল, এই বাড়িটাতেই তারা কাল রাতে ডাকাতি করতে এসেছিল। এখন তাকে দেখতে পেলে তো তারা পুলিশে দিয়ে দেবে।

অলিভার আর কিছু ভাবতে পারছিল না। যন্ত্রণায় পা যেন ছিঁড়ে পড়ছে। পুলিশে দেয় দিক। তবু তো একটা আশ্রয় পাওয়া যাবে। সে দরজার কড়া ধরে ঝাঁকাতে লাগল। তারপর অবসন্ন শরীরে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে জ্ঞান হারাল।

দরজার কড়া নাড়ানোর শব্দ ভিতরের সকলেই শুনতে পেয়েছিল। জাইলস ব্রিটলস, বাড়ির ঝি বসে বসে কাল রাতের কথাই আলোচনা করছিল।

এই সময় কড়া নাড়ার শব্দ শুনে সকলে চমকে উঠল। ভয়ে

কেউ দরজা খুলতে চায় না। শেষ পর্যন্ত সাহস করে দরজা খুলেই অবাক।

মাটিতে পড়ে আছে একটা বাচ্চা ছেলে।

জাইলস চেঁচিয়ে উঠল, আরে, এ ছেলেটা তো কালকের সেই ডাকাত।

ব্রিটলস চেঁচিয়ে বলল, ধর ধর পালিয়ে না যায়।

—আমার হাত থেকে পালানো অত সোজা! জাইলস অলিভারকে দুহাতে তুলে নিয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে বলল, কর্তা মা, দিদিমণি, ডাকাত ধরেছি।

মিসেস সেইলি রোজের সঙ্গে তখন ব্রেকফাষ্ট খেতে বসেছিলেন। ডাকাতের কথা শুনে ফ্যাকাসে হয়ে গেল তাঁর মুখ। তিনি উপর থেকে চেঁচিয়ে বললেন, পুলিশে খবর দাও।

জাইলস বলল, একেই কাল গুলি করেছিলাম। বেচারা অজ্ঞান হয়ে গেছে।

মিস রোজ বলল, তুমি আমাদের ডাক্তার লসবার্ণকে তাড়াতাড়ি ডেকে নিয়ে এসো। আমরা যাচ্ছি।

জাইলস বলল, আগে পুলিশ না আগে ডাক্তার?

ব্রিটলস বলল, আগে দরকার পুলিশ।

জাইলস বলল, দূর গাধা। আগে দরকার ডাক্তার।

ব্রিটলস বলল, আগে দরকার পুলিশ।

মিসেস সেইলি ওদের কথাবার্তা শুনে উপর থেকে চেঁচিয়ে বললেন, এখনও গেলে না তোমরা। শীগ্‌গির যাও।

ওরা ছুটল ডাক্তার আর পুলিশ ডাকতে।

ডাক্তার লসবার্ণ পাশেই থাকেন। তিনি এলেন আগে। অলিভারকে পরীক্ষা করে তিনি যখন ওষুধ দিচ্ছিলেন, তখন মিসেস সেইলি আর রোজ ঘরে ঢুকলেন।

অলিভারকে একটা সোফায় ওইভাবে শুয়ে রাখা থাকতে দেখেই রোজের অন্তর করুণায় ভরে গেল। আহা! এমন

সুন্দর ছেলে। এ আবার ডাকাত। অসম্ভব!

সে কাছে গিয়ে অলিভারের মাথার এলোমেলো চুল গুছিয়ে দিল। তার হাতের ছোঁয়া পেয়ে অলিভার চোখ মেলে হাসল।

মিসেস সেইলিও অলিভারকে দেখে অবাক হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন, একটা রুক্ষ চেহারার চোয়াড়ে লোককে দেখবেন। তার বদলে কোমল সুন্দর একটি ছেলে।

অবাক হয়ে মিসেস সেইলি বললেন, এত সুন্দর ছেলে কখনোই ডাকাত দলে থাকতে পারে না।

ডাক্তার লসবার্ণ বললেন, বাইরে থেকে দেখে চট করে কিছু বোঝা যায় না।

রোজ বলল, অসম্ভব। এত সুন্দর ছেলে ডাকাত না, এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি।

ডাক্তার লসবার্ণ হেসে বললেন, ম্যাডাম সুন্দর ছেলেরাই তাড়াতাড়ি পাপের খপ্পরে পড়ে। তুমি এ সংসারের কতটুকু খবর রাখো।

রোজ বলল, হয়তো হতে পারে। তবে তার নিশ্চয় কারণ আছে। ছেলেবেলায় ও হয়তো কিছুই পায়নি, তাই বাধ্য হয়ে খারাপ দলে ঢুকেছে।

লসবার্ণ বললেন, তোমার কথা সত্যি হতে পারে। কিন্তু ঢুকে যখন পড়েছে, তখন তো আইনের চোখে ও অপরাধী। পুলিশ ওকে তো ধরবে। রোজ মিসেস সেইলির দিকে তাকিয়ে বলল, পিসি, ওকে পুলিশে ধরিয়ে দিও না। কিছুতেই না।

মিসেস সেইলি বললেন, আমিও তো তাই ভাবছি। কিন্তু পুলিশে তো খবর চলে গেছে। পুলিশ এসে তো ওকে ধরে নিয়ে যাবে।

রোজ কাঁদ কাঁদ মুখে বলল, না পিসি, তুমি ওকে বাঁচাও।

মিসেস সেইলি ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি করা যায় বলুন তো।

ডাক্তার লসবার্ণ বললেন, ভারী মুস্কিলের কথা। আইন তার নিজের পথে চলবে। ব্যাপারটা চেপে যাওয়া যেত। কিন্তু জাইলস আর ব্রিটলস মুখ পাতলা লোক। ওদের সামলানো দরকার।

—ওদের আমি সামলাবো। হাতে কিছু গুঁজে দিলেই ওরা মুখ বন্ধ করে রাখবে।

—কিন্তু পুলিশের দারোগা তো ওদের জেরা করবে—তখন? জেরার মুখে ওরা ছেলেটার কথা বলে ফেলবে।

—তাহলে আপনি ওদের সামলান ডাক্তার, মিসেস মেইলি বললেন, যে করেই হোক ছেলেটাকে বাঁচাতে হবে। রোজেরও ছুচোখে মিনতি, আপনি ওকে বাঁচান ডাক্তার।

—আচ্ছা আমি দেখছি কি করা যায়।

ডাক্তার লসবার্ণ নীচে নেমে এলেন।

জাইলস আর ব্রিটলস বসে আবার গল্পে মেতে উঠেছিল। ডাক্তার এসে সোজাসুজি বললেন, জাইলস, আমার মনে হয় তোমার বিরাট একটা ভুল হয়েছে।

জাইলস হকচকিয়ে বলল, কিসের ভুল।

ডাক্তার বললেন, কাল খুব অন্ধকার ছিল—তার উপর বৃষ্টি এর মধ্যে লোক চেনা খুব সোজা ব্যাপার না। কাল যে ডাকাত ছেলেটি এসেছিল, সেই ছেলেটি আর আজকের ছেলেটি একই ছেলে এ তুমি শপথ করে বলতে পারো?

জাইলস বলল, তা পারি না অবশ্য।

ডাক্তার লসবার্ণ বলল, ডাকাতি যারা করতে আসে তারা বেশ বয়স্ক হয়, আর এ তো বাচ্চা ছেলে। ঠিক কিনা ব্রিটলস?

ব্রিটলস আমতা আমতা করে বলল, তা তো ঠিক। এ তো একেবারে বাচ্চা ছেলে।

—ডাক্তার লসবার্ণ বললেন, আর তাছাড়া আমি ডাক্তার হিসেবেই বলছি, এ ছেলের পায়ে গুলি-টুলি লাগেনি, এ পড়ে গিয়ে চোট পেয়েছে।

জাইলস হাঁ করে ডাক্তারের কথা শুনছিল।

ডাক্তার বললেন, জাইলস, তুমি তো বিচক্ষণ লোক। আশা করি আমার কথা বুঝতে পেরেছো। পুলিশকেও একথা বলবে।

জাইলস বলল, আজ্ঞে তা বলবো।

ডাক্তার বললেন, আর তুমি ব্রিটলস?

ব্রিটলস বলল, মিষ্টার জাইলস যা বলবেন, আমিও তাই বলবো।

ডাক্তার মৃদু হেসে বললেন, আর তাছাড়া মনে রেখো, এই সত্যি কথা বলার জন্যে কর্তা মা অবশ্য তোমাদের ভালো মতোই পুরস্কার দেবেন।

## ॥ দারোগাবাবুর জেরা ॥

কিছুক্ষণ বাদেই দারোগা সাহেব ব্ল্যাদার্স ঢুকলেন একদল পুলিশ সঙ্গে নিয়ে। মোটাসোটা চেহারা। বিরাট এক ভুঁড়ি বেল্ট দিয়ে বাঁধা। নাকের নীচে বিরাট এক গোঁফ।

ওরা আসতেই ডাক্তার লসবার্ণ ওদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

দারোগা সাহেব বাজখাঁই গলায় বললেন, কোথায় সেই ডাকাতটা?

—ডাকাত আবার কোথায়? ডাক্তার অবাক কণ্ঠে বললেন, আসলে গত রাত্রে যে ডাকাতির চেষ্টা হয়েছিল, সে সম্পর্কে খবর দেওয়া হয়েছে আপনাকে।

দারোগাবাবু চেয়ারে বসে বললেন, তবে যে বলা হল, একটা ডাকাত ধরেছে।

—ভুল বলেছে দারোগাবাবু। চাকর-বাকরের ব্যাপার। কি বলতে কি বলে ফেলেছে। আসলে গত রাত্রির ডাকাতির ব্যাপারটাই—

—হুম। ডাকাতির ব্যাপারটা বলুন।

মিসেস সেইলি দারোগাকে মোটামুটি বললেন ব্যাপারটা। অলিভারের কথা ঢেকে রেখেই বললেন।

সব শুনে-টুনে দারোগা সাহেব বিজ্ঞের মতো বললেন, হুম্। এ ডাকাতি নিশ্চয় 'লাংগুল' দলের কাজ নয়। কি বলো ডাফ?

দারোগা সাহেবের সহকারী ডাফ বললেন, আমারও তাই মনে হয়।

ডাক্তার মাথা নেড়ে বললেন, যার কাজই হোক, আপনারা ঠিকই অপরাধীকে পাকড়াও করতে পারবেন।

—পাকড়াও তো ঠিকই করতে পারবো। তবে আগে সেই ছেলেটির সাথে একবার কথা বলা দরকার।

—কোন্ ছেলেটি? ডাক্তার যেন আকাশ থেকে পড়লেন।

—যে ছেলেটিকে এই বাড়ির লোক পাকড়াও করেছে।

—আরে। সে ছেলেটি তো এ বাড়ির মানুষের আত্মীয়ের ছেলে। কদিন বাড়ি থেকে উধাও হয়েছিল। চাকররা দেখতে পেয়ে ধরে এনেছে। সে আবার ডাকাত। যত সব বুদ্ধু্র দল।

—তবু তার সাথে আমি একবার কথা বলবো।

—সে খুব অসুস্থ। অজ্ঞানই বলতে পারেন। আমি ওষুধ দিয়ে তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছি।

—ঠিক আছে। তাহলে আমি এ বাড়ির চাকর বাকরদের জেরা করবো। তাদের সাথেও ডাকাত দলের যোগ থাকতে পারে।

প্রথমে ডাকা হল জাইলসকে। দারোগা সাহেবের ভুঁড়ির দিকে তাকিয়ে তার বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

দারোগা সাহেব বললেন, কাল রাতে কজন ডাকাত এসেছিল?

জাইলস বলল, আজ্ঞে হুজুর, অনেক ডাকাত।

দারোগা গর্জন করে বললেন, অনেক ডাকাত আবার কি। ঠিক করে বলো, কজন ছিল?

—আজ্ঞে পাঁচ সাতজন।

—পাঁচজন না সাতজন? দারোগা বাবুর ভীম গর্জন।

—আজ্ঞে পাঁচজন।  ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে জাইলস বলল।

—তাদের দেখতে কেমন?

—আজ্ঞে তাদের দেখতে বড়ো ভয়ংকর।  যেমন লম্বা তেমনি মোটা—ভুঁড়িও আছে—

—চোপ্।  দারোগাবাবু ধমক দিলেন, তাদের হাতে কি ছিল?

—আজ্ঞে বন্দুক পিস্তল ছোরা।

—তাদের দেখে তুমি কি করলে?

—আজ্ঞে আমি দমাস করে গুলি ছুঁড়ে দিলাম।

—বাঃ।  বেশ বাহাদুরির কাজ করলে।  গুলি ছোঁড়ার পর কি হল?

—কি হল তা ঠিক বলতে পারবো না হুজুর।

—তা পারবে কেন?  দারোগাবাবু দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, তোর মতো আর কে আছে ডাক।

জাইলস এক ছুটে গিয়ে ব্রিটলসকে পাঠিয়ে দিল।  ব্রিটলস বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে এসে দাঁড়াল।

দারোগা বললেন, এ্যাই, তুই এখানে কি কাজ করিস?

—আজ্ঞে হুজুর, আমি এ বাড়ির হেড বেয়ারা।

—হেড বেয়ারা।  তোর সাথে ডাকাত দলের যোগ নেই তো?

—বাপের জন্মে আমি কোন দিন ডাকাত দেখিনি।

—কাল রাতে এ বাড়িতে ডাকাত এসেছিল।  দেখিসনি?

—না তো।

—এত হৈ চৈ হল—গুলি ছোঁড়াছুঁড়ি হল—তুই কিছু জানিস না?

—আজ্ঞে আমি তখন ঘুমোচ্ছিলাম।

—এত শব্দেও ঘুম ভাঙেনি?

—আজ্ঞে ভেঙেছিল বোধ হয়।  মনে হল অনেকগুলো লোক হৈ চৈ করছে।

—ওদের হাতে কি ছিল?

—কামান-টামান থাকতে পারে।

—দূর ব্যাটা। তুই এবার যা।

দারোগা সাহেব বিরক্ত হয়ে ওকে তাড়িয়ে দিলেন।

ডাক্তার লসবার্ণ মিটিমিটি হাসছিলেন।

এবার বললেন, দেখলেন তো এদের কাণ্ড। যখন যা মনে আসে তাই বলে ফ্যালে।

—হুম্। তাই তো দেখছি।

—অনেক পরিশ্রম করেছেন। এবার একটু বিশ্রাম করুন। ডাক্তার লসবার্ণ দারোগা সাহেব আর তার সহকারীকে পেট ভরে খানা আর মদ খাইয়ে দিলেন।

ভরপেট খানা আর মদ খেয়ে দারোগা সাহেব খুব খুশি। তার উপর ডাক্তার যখন তাদের পকেটে কিছু মোটা টাকা গুঁজে দিলেন, তখন তাঁরা আরো খুশি।

অলিভারের কথা তখন আর তাঁদের মনে নেই। কিংবা থাকলেও ইচ্ছা করেই ভুলে গেছেন। টাকা নিয়ে দলবল নিয়ে দারোগাবাবু থানায় ফিরে গেলেন।

## ॥ মিস রোজের কঠিন অসুখ ॥

মিসেস সেইলির বাড়িতে অলিভার ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠল। রোজের সেবা-শুশ্রূষা স্নেহ-ভালবাসা তাকে যেন নতুন জীবন এনে দিল। মিসেস সেইলিও অলিভারকে খুব ভালোবাসেন।

অলিভার এর মধ্যে একদিন তার জীবনের সব ঘটনা ওদের জানাল। শুনে ওদের মনে আরও সহানুভূতি হল। আহা বেচারা। সেই জন্মকাল থেকে কত কষ্টই না পেয়েছে।

অলিভারের উপর তাদের আদর-যত্ন আরও বেড়ে গেল। অলিভার সব সময় তাদের খুশি করতে চায়। তারা কোন কাজ

করতে বললে সে যেন ধন্য হয়ে যায়।

রোজকে বলে, তুমি আমাকে অনেক অনেক কাজ দাও না কেন দিদি ?

রোজ হেসে বলে, তোকে অনেক অনেক কাজ করতে হবে না। কাজের লোক অনেক আছে এ বাড়িতে।

অলিভার বলে, তোমাদের কোন কাজ করতে পারলে আমার খুব আনন্দ হয়।

—রোজ বলে, তুই যে অবস্থায় ছিলি, তার থেকে যে উদ্ধার পেয়েছিস, তাইতে আমাদের আনন্দ।

অলিভার বলল, আমাকে একবার মিষ্টার ব্রাউনলোর কাছে নিয়ে যাবে দিদি ? তিনি হয়তো আমাকে চোর ভাবছেন।

রোজ বলল, তার জন্যে চিন্তা কি। আজই ডাক্তার লসবার্ণের সাথে তোকে মিষ্টার ব্রাউনলোর বাড়িতে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

অলিভার সেদিন বিকেলে মিসেস সেইলির ঘোড়ার গাড়ীতে চড়ে মিষ্টার ব্রাউনলোর বাড়ির দিকে যাত্রা করল। সে বাড়িতে গিয়ে শুনল, ব্রাউনলো ওয়েষ্ট ইণ্ডিজ চলে গিয়েছেন। তার সঙ্গে গেছেন মিসেস বেডুয়িন আর তার বন্ধু।

হতাশ হয়ে অলিভার ফিরে এল।

কদিন পর মিসেস সেইলি ওদের সকলকে নিয়ে চলে গেলেন তার পল্লীভবনে।

জায়গাটা ভারী সুন্দর। আশে পাশে ছোট ছোট টিলা গাছপালা খোলা মাঠ ঝোপঝাড়। প্রকৃতি যেন এখানে সহজ সৌন্দর্যে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছে।

গ্রামের মধ্যেই একটা ছোট সুন্দর গীর্জা। কাছাকাছি কয়েকটা সমাধি।

অলিভার এখানে এসে এক নতুন জীবনের খোঁজ পেল। গ্রামের পথ ধরে ও আপন মনে ঘুরে বেড়ায়, ঝোপঝাড় থেকে কত কি তুলে আনে।

গীর্জার কাছে এক বৃদ্ধ মাষ্টার মশাইয়ের কাছে সে পড়তে যায়। বিকেল হলে রোজ আর মিসেস সেইলির সাথে গ্রামের পথে ঘুরে বেড়ায়। সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরে রোজ পিয়ানোর সামনে বসে গান গায়। আঃ। কি মিষ্টি সেই গান।

জীবন যে এত মধুর হতে পারে অলিভার কোনদিন স্বপ্নেও ভাবেনি।

দেখতে দেখতে এখানে তিন তিনটে মাস যে কিভাবে কোনখান দিয়ে কেটে গেল, তা বোঝা গেল না।

অন্যান্য দিনের মতো সেদিনও ওরা তিনজন বিকেলে বেড়িয়ে ফিরে এসেছে সন্ধ্যার পরে।

রোজ বসেছে পিয়ানোর সামনে। অলিভার মুগ্ধ হয়ে শুনছে রোজের গান।

হঠাৎ রোজের গান থেমে গেল। মাথাটা ঝুঁকে পড়ল পিয়ানোর উপর। মুখে একটা অস্ফুট আর্ত চীৎকার।

মিসেস সেইলি আর অলিভার ছুটে গেল। রোজের মুখ ফ্যাকাশে।

—কি হয়েছে রোজ ? মিসেস সেইলি রোজের হাত ধরলেন।

—বুকে খুব কষ্ট হচ্ছে। রোজ আস্তে আস্তে বলল ; মাথাটাও ঘুরছে।

—চল চল শুয়ে থাকবে চল।

মিসেস সেইলি রোজকে ধরে ধরে বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দিলেন। রোজ অবসন্নভাবে শুয়ে চোখ বুজল। ওর মুখে যন্ত্রণার ছাপ। দেখেই বোঝা যাচ্ছে খুব কষ্ট হচ্ছে।

—ডাক্তার ডাকবো কর্তামা ? অলিভার জিজ্ঞাসা করল।

—এখানে ডাক্তার কোথায় ? মিসেস সেইলি বললেন, এখানে কোন ডাক্তার নেই। যে হাতুড়ে একজন আছে, তাকে দিয়ে কোন কাজ হবে না।

—তাহলে কি হবে ? অলিভারের গলায় আকুলতা, ভালো

ডাক্তারকে যে করেই হোক আনতেই হবে।

—আমিও তো সেই কথাই ভাবছি। তুই একটা কাজ করতে পারবি ?

—নিশ্চয় পারবো।

—তুই আমার একটা চিঠি নিয়ে চলে যা ডাক্তার লসবার্ণের কাছে। এখান থেকে চার মাইল দূরে একটা গঞ্জ পাবি। গঞ্জ থেকে ঘোড়ায় চেপে লণ্ডনে চিঠি পৌঁছে দেবার লোক পাওয়া যায়। তাদের খোঁজ করে তুই এই চিঠি দিবি। পারবি তো এত সব কাজ ?

—খুব পারবো। তুমি এক্ষুণি চিঠি লিখে দাও।

মিসেস সেইলি ডাক্তার লসবার্ণকে চিঠি লিখে দিলেন। কিছু টাকা দিলেন অলিভারের হাতে।

সেই টাকা আর চিঠি নিয়ে অলিভার ছুটতে লাগল উর্ধ্বশ্বাসে।

ছুটতে ছুটতে খানা-খন্দ পেরিয়ে মাঠের আল ভেঙে সে পৌঁছালো গঞ্জে। খোঁজ নিয়ে সে হাজির হল 'জর্জ' নামে একটা হোটেলের সামনে। এখান থেকেই ঘোড়ার ডাক যায় লণ্ডনে।

তখন ডাক যাবার সময় ছিল না। তবুও অলিভার একজন ডাক-বাহককে হাতে পায়ে ধরে টাকা দিয়ে লণ্ডনে চিঠি নিয়ে যেতে রাজী করাল। তাকে বারবার বলে দিল, আমার দিদি খুব অসুস্থ। যেভাবেই হোক খুব তাড়াতাড়ি ডাক্তারের হাতে চিঠিখানা পৌঁছে দিও।

ডাক-বাহক ঘোড়ায় চেপে লণ্ডনের পথে যাত্রা করল। অলিভার হোটেলের সামনে থেকে ফিরবার জন্যে পা বাড়াল। আর সেই সময় তার ধাক্কা লেগে গেল কার সঙ্গে। একেই অন্ধকার, তার উপর কুয়াশা। কেউ কাউকে ভাল করে দেখতে পায়নি।

অলিভার অপ্রস্তুত হয়ে দাঁড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে অচেনা লোকটা ঘুষি বাগিয়ে তেড়ে এল, তুই ভেবেছিস কি ? কবর থেকে উঠে এসে আবার আমায় ভোগাবি ?

লোকটা তেড়ে এসেই ধপাস করে মাটিতে পড়ে গেল। মুখ দিয়ে

গোঁ গোঁ শব্দ হতে লাগল।

অলিভার তাড়াতাড়ি হোটেলের লোকজন ডেকে লোকটার চোখে-মুখে জল দেবার ব্যবস্থা করল।

এ দিকে রাত হয়ে যাচ্ছিল। সে আবার বাড়ির দিকে হাঁটতে লাগল। বাড়িতে এসে দেখল, রোজ সেই একভাবেই শুয়ে আছে। যন্ত্রণা আরও বেড়েছে। মিসেস সেইলি তার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন।

অলিভার এসে মাথার শিয়রে দাঁড়াল।

—চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিস অলিভার?

—হ্যাঁ কর্তামা। ডাক্তারবাবু চিঠি তাড়াতাড়ি পেয়ে যাবেন।

—চিঠি পেলেই ডাক্তার চলে আসবে এ বিশ্বাস আমার আছে, মিসেস সেইলি বললেন, এখন কখন আসে কে জানে।

ডাক্তার এলেন গভীর রাতে।

এসেই রোজকে ভাল করে পরীক্ষা করলেন। মুখ গম্ভীর হয়ে গেল তাঁর। ব্যাগ খুলে কি সব ওষুধ দিলেন। তারপর বাইরের ঘরে এসে বসলেন।

—কি অবস্থা ডাক্তারবাবু?

—অবস্থা খুব ভালো নয়। ডাক্তার গম্ভীর গলায় বললেন।

—কি বলছেন ডাক্তারবাবু? মিসেস সেইলি প্রায় চিৎকার করে উঠলেন।

—উতলা হয়ে কোন লাভ নেই। ওষুধ দিয়েছি। চব্বিশ ঘণ্টা সময়। সেরে উঠলে এর মধ্যে উঠবে, না সারার হলে—ডাক্তার চুপ করে গেলেন।

মিসেস সেইলি কোন কথা কথা বললেন না। চুপ করে বসে রইলেন বসার ঘরে। অলিভারও চুপচাপ। ঘড়ির কাঁটা এগোতে লাগল একটু একটু করে।

ডাক্তার এক একবার যান, দেখে আবার বসার ঘরে এসে বসেন। সারা রাত ধরে ওরা বসে। ভোর হল। ঘরের মধ্যে সূর্যের আলো

এসে ঢুকল। যন্ত্রচালিতের মতো ওরা সকালের কাজকর্ম সারলেন। খাবার দাবার পড়ে রইল। কারো কিছু মুখে দিতে ইচ্ছেও হল না।

সারা বাড়িতে অদ্ভুত এক স্তব্ধতা। সন্ধ্যের দিকে ডাক্তার রোজকে দেখতে গেলেন। অন্যান্য বার ফিরে আসেন গম্ভীর মুখে। এবার যেন মুখের ভাবে পরিবর্তনের চিহ্ন।

মিসেস সেইলি আর থাকতে পারলেন না। আকুল কণ্ঠে বললেন, এখন কেমন ডাক্তার? বাঁচবে তো?

—এখনও বহু বছর বাঁচবে রোজ। ডাক্তার নিশ্চিন্ত মুখে একটা সিগারেট ধরালেন, বিপদ কেটে গেছে। ভগবানকে ধন্যবাদ দিন।

মিসেস সেইলির চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। অলিভারের আনন্দে নাচতে ইচ্ছে হচ্ছিল। সামনে বসা ডাক্তারকে মনে হল: সাক্ষাৎ ভগবান। ও ছুটে গিয়ে ডাক্তারের দু'হাত ধরে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাল।

## ॥ হ্যারি ও রোজের ভালবাসা ॥

পরদিন সকালে পল্লীভবনে এসে হাজির হলেন হ্যারী সেইলি। হ্যারী মিসেস সেইলির একমাত্র ছেলে। লণ্ডনে আলাদা বাড়িতে থাকে। খুব বড় চাকরী করে, আর পার্লামেণ্টের মেম্বার। গণ্য-মান্য সমাজে তাঁর খুব নাম ডাক।

মিসেস সেইলির চিঠি পেয়ে তিনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলেন জাইলসকে সঙ্গে নিয়ে।

গেটের কাছে অলিভারকে দেখে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, এই যে মাষ্টার টুইষ্ট, খবর কি? মিস রোজ—

অলিভার ছুটে গাড়ীর কাছে গিয়ে বলল, ভালো আছেন। হ্যারী লাফ দিয়ে গাড়ী থেকে নেমে অলিভারের হাত ধরে ঝাঁকুনি

দিয়ে বললেন, ঠিক করে বলো—ভালো না মন্দ। আমাকে ধোঁকা দিও না কিন্তু।

অলিভার বলল, না-না সত্যি বলছি—রোজ দিদি ভালো আছেন। বিপদ কেটে গেছে। ডাক্তারবাবুও এখানে আছেন।

হ্যারী বললেন, উঃ। বাঁচলাম। চিঠি পাবার পর যে অবস্থায় কেটেছে আমার। মা কোথায়?

—তিনি রোজ দিদির ঘরেই আছেন।

—চল চল। আমার তো উড়ে যেতে ইচ্ছে করছে। হ্যারী অলিভারের হাত ধরে 'মা' 'মা' বলে ডাকতে ডাকতে সোজা উপরে উঠে গেলেন।

জাইলসও এল লাফাতে লাফাতে।

হ্যারী ঘরে ঢুকে রোজের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। রোজও তাকিয়ে রইল। ওর চোখের পাতা যেন কাঁপছিল।

হ্যারী মার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি আমাকে সঙ্গে সঙ্গে চিঠি দাওনি কেন মা?

মিসেস মেইলি বললেন, প্রথমে তো আমরা কিছু বুঝতে পারিনি। ডাক্তার এসে রোগের গুরুত্ব বলার সঙ্গে সঙ্গে তোকে চিঠি দিলাম।

হ্যারী ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বললেন, এখন মিস রোজ কেমন আছেন ডাক্তার লসবার্ণ?

—এখন বেশ ভালো। বিপদ অনেকটাই কেটে গেছে। দিন কতক বিশ্রাম নিলেই একেবারে সেরে উঠবেন।

—আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ডাক্তার লসবার্ণ। হ্যারী বললেন, আপনি না থাকলে কি যে হতো।

—সবই ভগবানের ইচ্ছা। ডাক্তার বললেন, এই বাচ্চা ছেলেটা দৌড় ঝাঁপ করে ঠিক মতো চিঠি পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করেছিল বলেই সব কিছু করা সম্ভব হল।

হ্যারী অলিভারের কাঁধে এক চাপড় মেরে বললেন, ও তো একটা

ক্ষুদে ডাকাত।

জাইলস এতক্ষণ ঘরের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। এবার গম্ভীর কণ্ঠে বলল, না বাবু, ওকে ডাকাত-টাকাত বলবেন না। সেবার দারোগাবাবু যা হেনস্থা করল—

ঘরের সকলে হো হো করে হেসে উঠল।

ডাক্তার লসবার্ণ বললেন, ভালো কথা জাইলস, এর মধ্যে বাড়িতে আর ডাকাত আসেনি তো?

—আমি থাকতে ডাকাত আসবে কোন্ সাহসে? জাইলস বেশ গর্বের সঙ্গে বলল।

—তা যা বলেছো। ডাক্তার লসবার্ণ হেসে বললেন, তোমার মতো বীরপুরুষ যে এই বাড়িতে থাকে, তার ধারে কাছেও ডাকাত ঘেঁষতে পারে না।

—কি যে বলেন ডাক্তারবাবু। হে হে—লজ্জিতভাবে হাসতে লাগল জাইলস।

রোজ সেরে উঠতে লাগল। ডাক্তার লসবার্ণ বিদায় নিয়ে চলে গেলেন।

হ্যারী কদিন পল্লীভবনে থেকে গেলেন। তিনি রোজ সকালে অলিভারকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে বেরোন। ফেরার সময় দুজনের হাতে থাকে একরাশ ফুল। মিস রোজ ফুলগুলো পেয়ে খুব খুশি। ফুল পেলে তার মুখে ফুলের মতোই হাসি ফুটে ওঠে।

হ্যারী ঘরে ঢুকলে অলিভার অন্য কাজ করতে চলে যায়। সে লক্ষ্য করে, হ্যারীকে দেখলে রোজ দিদির মুখে যেন খুশির আলো ফুটে ওঠে। অন্য দিকে কেমন যেন বিষণ্ণতায় তার সুন্দর চোখ জোড়া চিক চিক করতে থাকে।

কদিন বেশ ভালোভাবে কেটে গেল। হ্যারীর অনেক কাজকর্ম জমে আছে লণ্ডনে। তার ফেরার সময় হয়েছে। ফিরে যাবার আগের দিন সন্ধ্যায় হ্যারী রোজের ঘরে এসে বললেন, রোজ, আমি সকালেই চলে যাচ্ছি। আমার খুব খারাপ লাগছে তোমাকে ছেড়ে

যেতে।

রোজ মৃদুকণ্ঠে বলল, তুমি চলে গেলে আমারও খুব খারাপ লাগবে।

হ্যারী হেসে বলল, ছাড়াছাড়িটা যখন দুজনের পক্ষেই খুব দুঃখের ব্যাপার, তখন এটা যাতে না হয় তার জন্যে তাহলে চেষ্টা করি কি বলো।

রোজ মুখ নীচু করে বসে থাকে।

হ্যারী বললেন, তোমাকে আমি কতখানি ভালোবাসি, সে শুধু ভগবানই জানেন। তোমাকে বিয়ে না করা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই রোজ।

রোজ বলল, আমিও তোমাকে কতখানি ভালোবাসি, সে ভগবান জানেন। আমার মন সব সময়ই তোমার কাছে পড়ে থাকে। তুমি আমাকে বিয়ে করতে চাও এর চেয়ে সৌভাগ্য আর আমার কি হতে পারে। কিন্তু আমি যে নিরুপায়।

—কেন, একথা বলছো কেন রোজ?

—তুমি তো জানো আমার নিজের বলতে কেউ নেই। তোমার মা আমাকে মেয়ের মতো করে মানুষ করেছেন। আমার নামে কত অপবাদ দেওয়া হয়েছে, তা সত্ত্বেও তিনি আমাকে ভালোবাসেন।

—আমিও তো তোমাকে ভালোবাসি রোজ। তোমার নামে যে যা খুসি অপবাদ দিক, তাতে আমার কোনো লাভ ক্ষতি নেই।

—তোমার না থাকলেও আমার আছে হ্যারী। রোজ আস্তে আস্তে বলল, তোমার এত নাম ডাক এত প্রতিপত্তি। আমার মতো পথের মেয়েকে বিয়ে করলে তোমার ক্ষতি ছাড়া লাভ হবে না।

—সেটা আমার ব্যাপার। তুমি একটু বুঝতে চেষ্টা করো লক্ষ্মীটি।

—আমি বুঝেই তোমাকে বলছি হ্যারী, তুমি আমাকে ভুল বুঝো না। তুমি আমাকে বিয়ে করলে সমাজ তোমাকে নিয়ে হাসাহাসি

করবে, আর আমাকেও ছেড়ে কথা বলবে না। বলবে আমি তোমার টাকা পয়সা সম্পত্তির লোভেই তোমাকে বিয়ে করেছি।

—লোকের বলায় কি এসে যায় রোজ ?

—অনেক কিছুই এসে যায় হ্যারী। আমি তো হাজার হলেও তোমাদের করুণার পাত্রী সে কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। ওই অলিভার আর আমার অবস্থা তো একই।

বলতে বলতে রোজের দু চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়ল।

হ্যারী তাড়াতাড়ি উঠে ওর চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে বলল, ঠিক আছে। এক বছর সময় নাও। এর মধ্যে দেখবে অনেক কিছুর পরিবর্তন হয়েছে। তখন আমার কথা আবার ভেবে দেখবে, বলো।

—দেখবো হ্যারী, নিশ্চয়। রোজ কাঁদতে কাঁদতে বলল, এক বছর কেন, আমি সারাজীবন শুধু তোমার জন্যেই তপস্যা করে কাটাবো এ তুমি জেনে রাখো।

হ্যারী রোজকে আদর করে বিদায় নিল।

## ॥ রায়বাঘিনীর হাতে বাম্বল জব্দ ॥

মিষ্টার বাম্বল মিসেস কর্নিকে বিয়ে করার পর খুব বিপদে পড়ে গেছেন। দু মাস হল বিয়ে হয়েছে। এর মধ্যেই তিনি একেবারে বেলুনের মতো চুপসে গেছেন। কোথায় গেছে তাঁর সেই চকচকে পোশাক। এখন তাঁর অঙ্গে ঢিলে ঢালা কোঁচকানো পোশাক। চেহারা রোগা হয়ে গেছে। সেই হম্বিতম্বি আর নেই।

মিসেস কর্নি এখন মিসেস বাম্বল হয়ে হম্বিতম্বির সমস্ত দায়িত্ব নিজে নিয়েছেন। তিনি এখন মিষ্টার বাম্বলের কর্তা। তাঁর হুকুম ছাড়া মিষ্টার বাম্বলের এক পা-ও কোথাও যাবার হুকুম নেই। মিসেস বাম্বল এখন রায়বাঘিনী।

উঠতে বসতে দুজনের ঝগড়া।

সেদিনও কি নিয়ে তুজনের তুমুল ঝগড়া বেধে গেল। মিষ্টার বাম্বল বললেন, উঃ। মাত্র তু মাস বিয়ে হয়েছে, মনে হচ্ছে যেন তুশো বছর ধরে আগুনে ভাজা ভাজা হচ্ছি।

মিসেস বাম্বলও পাশ থেকে খ্যানখেনে গলায় বললেন, ভাজা ভাজা হবে না তো কি মোহানের ঠাণ্ডা জলে ভাসবো বুড়ো গাধা কোথাকার।

মিষ্টার বাম্বল কপাল চাপড়ে বললেন, হায় হায়। কি ভুলই না করেছি আমি। মাত্র ছখানা ভাঙা চামচে, একটা মরচে পড়া রূপোর বাটি, এক কাঁধ ভাঙা তুধের গামলা, কিছু ভাঙা চেয়ার টেবিল, আর মাত্তর কুড়িটা পাউণ্ড—এর লোভেই জীবনটা বিক্রি করেছি আমি।

—তোমার জীবনের দাম তো কানাকড়িও নয়। এই যা পেয়েছ তোমার বাপের ভাগ্যি।

—বাপ তুলো না বলছি।

—একশোবার তুলবো।

—ভালো হবে না বলছি।

—কি করবে? মারবে?

মিসেস বাম্বল তাঁর বিশাল বপু নিয়ে এসে বুক ফুলিয়ে বাম্বলের সামনে দাঁড়ালেন।

তাঁর সে রণচণ্ডী চেহারা দেখে ভয়ে ঘাবড়ে গেলেন মিষ্টার বাম্বল। একথা সত্যি, মিসেস বাম্বল তাঁকে তু-চার ঘা দিলে তিনি শেষ হয়ে যাবেন।

বেগতিক দেখে তিনি একটা চেয়ারে ধপ করে বসে পড়ে রুমাল দিয়ে নাক মুছলেন।

বাম্বল রণে ভঙ্গ দিলেন দেখে মিসেস কিছুটা হতাশ হলেন। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে স্বামীর সামনে গিয়ে বললেন, আজ কি সারাদিন চেয়ারে বসে নাক ঝাড়বে?

—আমার নাক আছে, আমি ঝাড়বো। তাতে তোমার কি।



আমার উপর তোমার কোন অধিকার নেই।

—কার অধিকার আছে ?

—আমার অধিকার। মিষ্টার বাম্বল নিজের মাথায় টোকা দিয়ে বললেন, আমার উপর শুধু আমারই অধিকার, বুঝলে ?

—বুঝলাম। মিসেস বাম্বল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন।

মিষ্টার বাম্বল ভাবলেন, মিসেস বোধ হয় একটু কোণঠাসা হয়েছেন। তাই তিনি এবার বেশ গলা চড়িয়ে বললেন, তোমার উপরও শুধু আমারই অধিকার, একথাটাও জেনে রাখো। আইন পুরুষদেরই শুধু অধিকার দিয়েছে। মেয়েদের কাজ হল, নত মস্তকে পুরুষের আদেশ পালন করা।

—তুমি একটা শয়তান—তুমি একটা জানোয়ার—বলতে বলতে মিসেস বাম্বল ভ্যা করে কেঁদে ফেললেন।

অত বড় জাঁদরেল মহিলার কান্না দেখে মিষ্টার বাম্বলের মনে খুব ফূর্তি। তাঁর মনে হল, হ্যাঁ—তিনি একটা পুরুষসিংহ বটে। এমন একটা সিংহী জব্দ করেছেন।

এবার উঠে দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, কাঁদো কাঁদো—আরো বেশী করে কাঁদো—বদ মেয়েছেলে কোথাকার—পুরুষসিংহ কাকে বলে ছাখো—

মিষ্টার বাম্বল মনের আনন্দে শিস দিতে দিতে বাইরে যাবার জন্যে ফিরে দাঁড়িয়েছেন, এমন সময় মিসেস বাম্বল পাগলের মতো ছুটে এসে স্বামীর ঘাড়ে এক ঘুষি বসিয়ে দিলেন।

বোঁ করে উড়ে গেল মিষ্টার বাম্বলের মাথার টুপি। ততক্ষণে তাঁর উপর শুরু হয়ে গেছে কিল-চড়-ঘুষির বৃষ্টি।

মিষ্টার বাম্বল ঝড়ে পড়া গাছের মতো বসে পড়তেই মিসেস বাম্বল তাঁকে চ্যাঙদোলা করে তুলে এনে একটা চেয়ারে জোর করে বসিয়ে দিলেন। তারপর এক হ্যাঁচকা টানে তাঁর মাথা থেকে কয়েক গোছা চুল খাবলে নিয়ে বললেন, পুরুষসিংহকে খুব কম শাস্তিই দিলাম। এবার দয়া করে বেরিয়ে যাও এখান থেকে। নইলে তোমার কপালে

আরো আছে।

মিষ্টার বাম্বল ফ্যাল ফ্যাল করে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইলেন।

মিসেস বাম্বল হুঙ্কার ছাড়লেন, এখনও হাঁদার মতো বসে আছো? গেট আউট।

এই বলে তেড়ে আসতেই মিষ্টার বাম্বল উঠেই চোঁ চোঁ দৌড়।

## ॥ ওই লোকটা কে? ॥

মিষ্টার বাম্বল পাগলের মতো পথে পথে ঘুরতে লাগলেন। মনে মনে যে মিসেস বাম্বলকে কত গালাগালি দিলেন তার ইয়ত্তা নেই। ধুত্তোরি। ঘেন্না ধরে গেল বিয়ের নামে। লোকে যে কি সুখে বিয়ে করে। মাত্র দু মাসেই এই। দু বছরে না জানি কি হবে। ততদিন কি আর তিনি বেঁচে থাকবেন। মিসেসের আগের স্বামীর মতো দশা হবে তাঁর।

এর মধ্যে আবার ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমে গেল। এবার বৃষ্টিকে গালাগালি দিতে দিতে বাম্বল একটা মদের দোকানে ঢুকে এক গ্লাস মদ নিয়ে বসলেন।

প্রায় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ঢুকল আর একটি লোক। বেশ লম্বা। রঙ তামাটে। লম্বা ঝুলের কোট পরা। দেখলেই বোঝা যায় নেশা করা লোক।

লোকটা এসেই ধপ করে বাম্বলের সামনে বসে পড়ল। তারপর পুরো এক বোতল মদ নিয়ে বসল। বাম্বল মদ খেতে খেতে কটমট করে তাকালেন লোকটার দিকে। লোকটা মদ খেতে খেতে বারবার দেখছিল বাম্বলের দিকে। মুখে মৃদু মৃদু হাসি।

মিষ্টার বাম্বল আর থাকতে না পেরে বললেন, মশাই কি এখানে নতুন?

লোকটা হেসে বলল, তা এক রকম নতুনই বলতে পারেন। আমি

আপনার খোঁজেই এসেছি।

—আমার খোঁজে? মিষ্টার বাম্বল অবাক হয়ে বললেন, আমি তো আপনাকে চিনি না।

—কোন দরকার নেই চেনার। আমিও আপনাকে চিনি না। তবে নিজের গরজেই চিনতে হয়েছে। আপনি তো মিষ্টার বাম্বল—অনাথ আশ্রমের ম্যানেজার।

—আমি বর্তমানে অন্যতম কর্তাব্যক্তি। বাম্বল গম্ভীর হয়ে বললেন, আমার প্রমোশন হয়েছে।

—তা বেশ, বেশ, শুনে খুশি হলাম। আমি আপনার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম। দেখলাম আপনি বেরিয়ে যাচ্ছেন। পিছু পিছু এসে আপনাকে ধরেছি।

—বেশ করেছেন। এবার আপনার মতলবখানা কি খুলে বলুন তো।

—মতলব আর কিছু নয়, দু চারটে খবর জানতে চাই শুধু। তবে এমনিতে নয়, কিছু দান দিচ্ছি। ধরুন।

লোকটা পকেট থেকে দুটো নোট বের করে বাম্বলের পকেটে গুঁজে দিল।

বাম্বল আবার সে দুটো বের করে ভাল করে পরীক্ষা করে পকেটে পুরলেন।

লোকটা বলল, এটা আগাম দিচ্ছি। খবর অনুযায়ী আরও পাবেন।

—বলুন কি খবর জানতে চান।

—বছর বারো আগে আপনাদের আশ্রমের একটি শাখায় একটি ছেলের জন্ম হয়েছিল মনে আছে সে কথা?

—আমাদের আশ্রমে রোজই গাদা গাদা ছেলের জন্ম হচ্ছে। কে তার খোঁজ রাখে?

—দুর মশাই, ভালো করে মনে করুন তো। লোকটা বিরক্ত হয়ে বলল, বছর বারো আগে একজন অনাথা মেয়েছেলে আপনাদের

আশ্রমে একটি ছেলের জন্ম দিয়ে মারা গেল।

—ওঃ। অলিভারের কথা বলছেন। বাম্বল এবার উৎসাহের সঙ্গে বললেন, ছোঁড়াটা ভারি বজ্জাত।

—অলিভার বজ্জাত হোক সজ্জাত হোক তাতে আমার কিছু এসে যায় না। আমি অলিভারের খবর জানতে চাইছি না।

—তবে কার খবর জানতে চাইছেন?

—আমি জানতে চাইছি সেই বুড়ী ধাইয়ের খবর যে জন্মের সময় অলিভারের মায়ের কাছে ছিল।

—ওঃ। সেই স্যালী বুড়ী। সে তো মারা গেছে।

—মারা গেছে? লোকটার কপালে চিন্তার রেখা ফুটে উঠল, ভারী মুস্কিল হলো তো তাহলে।

—স্যালী বুড়ী মারা গেছে তাতে আপনার মুস্কিল কিসের?

—সে সব জেনে আপনি কি করবেন। বেঁচে থাকলে আপনিও বেশ কিছু টাকা পেতেন।

মিষ্টার বাম্বল খুব চালাক মানুষ। তিনি বুঝতে পারলেন যে এই লোকটি এমন কিছু খবর জানতে চায় যা সম্ভবত স্যালী জানতো। স্যালী বুড়ী মরবার সময় তাঁর স্ত্রীকে কি সব গোপন কথা বলে গিয়েছিল—তবে কি লোকটা সেই গোপন কথা জানতে চায়?

লোকটা মদের দাম মিটিয়ে দিয়ে বলল, আপনারও বরাত খারাপ। যাক গে চলি।

মিষ্টার বাম্বল বললেন, শুনুন মিষ্টার, স্যালী বুড়ী মারা গেছে বটে। তবে মরার আগে সে কিছু গোপন কথা এক মহিলাকে বলে গেছে তা জানি।

লোকটি একথা শুনে আবার ধপ করে বসে পড়ল। তার চোখে মুখে ভয়ের রেখা।

মিষ্টার বাম্বল বললেন, কি হল?

লোকটি বলল, কিছু হয়নি। সেই মহিলাটিকে আপনি চেনেন?

মিষ্টার বাম্বল বললেন, মোটামুটি চিনি।

লোকটি বলল, তার সাথে আমাকে একবার দেখা করতেই হবে। কি করে দেখা পাওয়া যাবে?

—একমাত্র আমার মাধ্যমেই তার সাথে দেখা হওয়া সম্ভব। বাম্বল গম্ভীর ভাবে বললেন।

—কাল রাত নটা নাগাদ তাকে নিয়ে এই ঠিকানায় চলে আস্থন। আপনাকে খুশি করে দেবো।

এই বলে লোকটি একটি ঠিকানা লেখা কাগজ বাম্বলের হাতে দিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল।

মিষ্টার বাম্বল হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন কাগজটার দিকে। এতে শুধু ঠিকানাই লেখা আছে—কারো নাম লেখা নেই।

লোকটা কে?

## ॥ মংকস-এর শয়তানি ॥

পরদিন সেই ঠিকানা লেখা কাগজটা নিয়ে মিষ্টার বাম্বল মিসেসকে সঙ্গে নিয়ে খুঁজতে খুঁজতে একটা বস্তি অঞ্চলে হাজির হলেন।

মিসেস প্রথমে আসতে চাননি। বাম্বল বুঝিয়েছেন খুব বড় পার্টি গিন্নী। গোপন খবরটা বেচে অনেক টাকা পাবে তুমি।

একটা ভাঙা বাড়ির সঙ্গে ঠিকানা মিলে যেতে বাম্বল বাড়িটার সামনে দাঁড়ালেন। ঠিক পাশ দিয়ে নদী বয়ে যাচ্ছে।

দরজার কড়া নাড়তে উপর থেকে কে একজন বলল, উপরে চলে এসো। ওই যে মই রয়েছে।

মিষ্টার বাম্বল মিসেসের দিকে তাকালেন। তিনি রোগা মানুষ। মই বেয়ে উঠে যাবেন।

কিন্তু মিসেস?

—দেখা গেল, মিসেস বাম্বলও মই বেয়ে উঠতে পারেন। টাকার জন্য সবাই সব কিছু পারে।

ঘরের ভিতরে একটা টেবিল। চারধারে ভাঙা চেয়ার। টেবিলের উপর মদের বোতল। কালকের সেই লোকটা বসে আছে।

মিষ্টার বাম্বল বললেন, আমরা ঠিক সময়েই এসেছি মিষ্টার—

—আমার নাম মংকস। লোকটি গম্ভীর ভাবে বলল, এই কি সেই মহিলা ?

—হ্যাঁ, ইনিই সেই মহিলা যাকে স্যালী বুড়ী গোপন কথা বলে গিয়েছিল।

—ঠিক আছে। এর কাছে আমি কিছু খবর জানতে চাই। আপনি বাইরে গিয়ে বসুন।

—সে কি কথা। আমি বাইরে গিয়ে বসবো কেন ? মিষ্টার বাম্বল বিরক্ত হলেন, আপনি আমার সামনেই এর কাছে গোপন কথা জিজ্ঞাসা করতে পারেন।

—আপনি এর কে যে আপনার সামনে উনি গোপন খবর বলবেন ? মংকস রেগে বলল, আপনি বাইরে গিয়ে বসুন।

—আমি বাইরে যাবো না। বাম্বল জোর দিয়ে বললেন, আপনি জেনে রাখুন সমস্ত গোপন কথা জানবার অধিকার আইন আমায় দিয়েছে।

—তুমি এবার থামবে ? মিসেস বাম্বল ধমক দিলেন।

—থামবো কেন ? মিষ্টার বাম্বল চোখ পাকিয়ে বললেন, ব'ল আইনত আমরা স্বামী-স্ত্রী নই ? আমাদের মধ্যে কি গোপন থাকতে পারে ?

—ওঃ। তাই বলুন। মংকস গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ইনি যদি সত্যি সত্যি আপনার স্ত্রী হন, তাহলে অবশ্য আমার বলার কিছু নেই। আচ্ছা মিসেস বাম্বল, সেই স্যালী বুড়ী মরার আগে আপনাকে কি গোপন কথা বলে গিয়েছিল ?

—সে এমন কিছু নয়। মিসেস বাম্বল উদাসীন ভাবে বললেন, খুবই সাধারণ দু'চারটে কথা।

—কি কথা বলুন তো ?

—আমরা কি এই রাত্তির করে আপনার সাথে খোস গল্প করতে এসেছি। মিসেস বাম্বল কড়া গলায় বললেন, গোপন কথা জানবার জন্যে দাম দিতে হয়।

মংকস বুঝল, মিসেস বাম্বল তার কর্তার মতো ঢ্যাঁড়স নয়। টাকা না দিলে এ মুখ খুলবে না। তাই সে বলল, কত টাকা দিতে হবে?

মিসেস বাম্বল বললেন, ত্রিশ পাউণ্ড।

—ওটা বেশী হয়ে যাচ্ছে। কম করুন।

—পারবো না। কত দিতে পারেন আপনি?

—কুড়ি পাউণ্ড।

—অসম্ভব। পঁচিশ পাউণ্ডের কমে হবে না এবং তাও অগ্রিম দিতে হবে। সাফ কথা।

মংকস বুঝল এ ঝানু মেয়েমানুষ। টাকা না দিলে কাজ হবে না।

সে পঁচিশ পাউণ্ড মিসেস বাম্বলের হাতে দিয়ে বলল, এবার দয়া করে গোপন খবরটা বলে ফেলুন।

—টাকাটা যখন পেলাম নিশ্চয় বলবো। মিসেস বাম্বল বললেন, স্যালী বুড়ী মরবার আগে আমাকে বলে গিয়েছিল, অলিভারের মা তার কাছে একটি সোনার জিনিস গচ্ছিত রেখেছিল।

—জিনিসটা কোথায়? মংকস সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল।

—কোথায় তার আমি কি জানি। আমাকে এই কথাটা বলেই বুড়ী পটল তুলেছে।

—বুড়ী পটল তুলেছে, এখন তোমাকেও পটল তুলতে হবে, মংকস হিংস্রভাবে বলল, যদি এর পরের কথাটা না বলো।

—পরের কথা কিছু নেই। বুড়ী যা বলেছে তাই বললাম।

—তুমি সত্যি ঘুঘু মেয়েছেলে। দেখবে তবে মজা।

এই বলে মংকস কি একটা বোতাম টিপল। সঙ্গে সঙ্গে সরসর করে মেঝের একটা তক্তা সরে গেল।

মিষ্টার বাম্বল ভয়ে আঁতকে উঠলেন, আরে সর্বনাশ। নীচে যে

দেখছি নদীর জল।

মংকস হিংস্র হাসি হেসে বলল, আর একটি চাবি টিপলেই তোমাদের চেয়ারের নীচের কাঠ সরে যাবে। কর্তা গিন্নী একসঙ্গে ঝপাং করে পড়ে যাবে নদীর জলে। কেউ তোমাদের খোঁজও পাবে না।

—ও গিন্নী, যা জানো বলে দাও। মিষ্টার বাম্বল ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বললেন, আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।

—আপনি আমাদের ভয় দেখাচ্ছেন? মিসেস বাম্বল কঠিন স্বরে বললেন।

—আমার নিজের বাঁচার জন্যেই এসব করতে হবে। তাড়াতাড়ি বলে ফ্যালো—

মংকস আর একটা চাবিতে হাত রাখল।

—বলছি।, মিসেস বাম্বল ভয়ার্ত কণ্ঠে বললেন, স্যালী বুড়ী সোনার জিনিসটার কথা বলে মরে গেল। আমার খুব কৌতূহল হল। ওকে কবর দেবার আগে আমি ওর কাপড় খুঁজে দেখলাম। সোনার জিনিস পেলাম না—পেলাম একটা বন্ধকী রসিদ।

—তার মানে—বুড়ী সেই জিনিসটা বন্ধক দিয়েছিল?

—অর্থাভাবে পড়ে দিয়েছিল। আমি সেই রসিদটা নিয়ে দোকানে গিয়ে টাকা দিয়ে সোনার জিনিসটা ছাড়িয়ে এনেছি।

—সঙ্গে আছে সেটা?

—আছে। একটু ইতঃস্তত করে মিসেস বাম্বল একটি ছোট ব্যাগ খুললেন। ব্যাগ থেকে বেরোল একটি সোনার লকেট আর একটা বিয়ের আংটি। আংটির উপর লেখা 'অ্যাগনেস'।

মংকস ছোঁ মেরে জিনিস দুটো নিয়ে ফাঁকা জায়গাটার মধ্যে ছুঁড়ে দিল। অন্ধকারে ওগুলো নদীর জলে পড়ে তলিয়ে গেল।

মংকস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলল, বাঁচলাম। মস্ত বড় একটা আপদ গেল। এবার তোমরাও ভাগো।

—আমরা ভাগবো? মিষ্টার বাম্বল বললেন।

সোজা মই বেয়ে নীচে চলে যাও। আর শোন, এ সম্বন্ধে কাউকে একটি কথা বলেছো কি শেষ করে দেব। মনে থাকে যেন।

## ॥ ন্যানসির মহত্ত্ব ॥

বিল সাইক্‌স্‌ তার আগের ডেরা ছেড়ে অন্য একটা ডেরায় লুকিয়ে ছিল। পুলিশ তার খোঁজ করছিল ভীষণ ভাবে। এই জন্যে তার বাইরে বেরোবার উপায় ছিল না। হাতে টাকা পয়সা ছিল না। অবস্থা খুব সঙ্গীন। ন্যানসি সাইকস্‌কে খুব ভালবাসত। সেই কোনরকমে কিছু টাকা পয়সা জোগাড় করে খরচ চালাত।

একেই অর্থাভাব, তার উপর আবার অসুস্থ। সাইকস্‌-এর মেজাজ এমনিতেই চড়া। এখন তো একেবারে ক্ষ্যাপা।

সেদিন ফ্যাগিন ঘরে ঢুকতেই সাইকস্‌ চেঁচিয়ে বলল, বলি মালকড়ি সঙ্গে এনেছো কিছু ?

—আমার হাতে এখন টাকা পয়সা কিছু নেই।

—তোমার হাতে কবে আবার টাকা থাকে। ব্যাটা চাচা, সাইকস রাগে চেঁচিয়ে উঠল। ওসব আমি শুনতে চাই না। আজকেই আমার টাকা চাই।

—টাকা কোথায় পাবো ?

—টাকা তোমার বাড়িতে আছে। সেখান থেকে পাবে। সাইকস্‌ দাঁত খিঁচিয়ে বলল। আজকের মধ্যে টাকা না দিলে তোমাকে আমি খুন করে ফেলবো।

—ঠিক আছে। আমি জ্যাকের হাত দিয়ে কিছু টাকা পাঠিয়ে দিচ্ছি।

—উঁহু। ওসব জ্যাক ট্যাক জানি না। ন্যানসি তোমার সঙ্গে যাবে। তার হাতে টাকা দেবে।

—ঠিক আছে। তাই হবে। ফ্যাগিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,

ন্যানসি চলুক।

ফ্যাগিনের সঙ্গে ন্যানসি গেল তার ডেরায়। ন্যানসিকে অপেক্ষা করতে বলে সে গেল টাকা আনতে। টাকা সে কোথায় রাখে কেউ জানে না।

ন্যানসি বসে আছে, এমন সময় ঘরে ঢুকল মংকস। ন্যানসি মংকসকে চেনে না। মংকসও ন্যানসিকে চেনে না।

মংকস্ ন্যানসিকে জিজ্ঞাসা করল। ফ্যাগিন কোথায়? ন্যানসি বলল, অন্য ঘরে গেছে।

—তুমি কে?

—সে খবরে তোমার কাজ কি? ন্যানসি ঝাঁঝিয়ে উঠল, নিজের চরকায় তেল দাও গে।

মংকস শিস দিয়ে বলল, অত মেজাজ ভালো নয় মহারানী, পস্তাতে হবে।

এই সময় ফ্যাগিন ফিরে এল। মংকসকে দেখে চমকে উঠল। ন্যানসির হাতে কিছু টাকা দিয়ে বলল, এবার তুমি তাড়াতাড়ি চলে যাও। আমার এর সাথে জরুরী কথা আছে।

ন্যানসি বুঝতে পারল, তাকে তাড়াতে চায় ফ্যাগিন। সে টাকাটা নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এল।

ফ্যাগিন মংকসকে সঙ্গে নিয়ে অন্য ঘরে ঢুকে গেল।

ন্যানসি কিন্তু চলে যায়নি। সে আবার ফিরে এল। এ বাড়ির সব কিছু তার চেনা। সে একটা সরু গলির পাশ দিয়ে গিয়ে পা টিপে টিপে একগাদা প্যাকিং কেসের আড়ালে দাঁড়াল। তারপর ঘরটার পাশে দাঁড়িয়ে ভিতরের কথা শুনতে লাগল।

ভিতরে তখন কথা বলছিল মংকস আর ফ্যাগিন। ওরা কেউই আস্তে কথা বলে না। এই কারণে ভিতরের সব কথাই শুনতে পাচ্ছিল ন্যানসি। শুনতে শুনতে ও খুব উত্তেজিত হয়ে উঠল। ওর মুখ লাল হয়ে উঠল উত্তেজনায়।

কিছুক্ষণ বাদে পা টিপে টিপে আবার বাইরে বেরিয়ে গেল।

ডেরায় পৌঁছে সাইক্স্‌কে টাকা দিয়েই ন্যানসি বলল, আমি একটু বাইরে যাচ্ছি। সাইক্স্‌ অবাক হয়ে বলল, এই মাত্র এলে! এখনই আবার কোথায় যাচ্ছো?

—আমার একটু দরকার আছে। এক্ষুনি ফিরে আসবো।

—না। তুমি এখন কোথাও যেতে পারবে না। সাইকস্‌ গলা চড়িয়ে বলল, এখন মদটদ আনার ব্যবস্থা কর।

—আমি এসে সব ব্যবস্থা করবো। আমাকে যেতে দাও লক্ষ্মীটি।

—খবরদার। এখন যেতে পারবে না। এখন গেলে গলা টিপে মেরে ফেলবো।

সাইকস্‌-এর মূর্তি দেখে ন্যানসি আর যাওয়ার কথা বলতে ভরসা পেল না। সে সাইকস্‌-এর খাবারের ব্যবস্থা করল। খেয়ে দেয়ে প্রচুর মদ পান করে সাইকস্‌ ঘুমিয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে ন্যানসি উঠে পড়ল। পোশাক পরে সোজা হাজির হল হাইড পার্কে মিসেস সেইলির বাড়িতে।

দারোয়ানকে বলল, মিস রোজের সাথে দেখা করতে চাই।

ন্যানসির পোশাকের ছিরি দেখে দারোয়ান তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলল, তোমার নাম কি? ন্যানসি বলল, নাম বলে কোন লাভ নেই। মিস রোজের সঙ্গে আমার খুব জরুরী কথা আছে।

—তোমার মতো মেয়ের সাথে কোন জরুরী কথা থাকতে পারে না রোজ দিদিমণির। ভাগো—

ঠিক সেই সময় উপর থেকে শোনা গেল তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর, জো ওকে ভিতরে আসতে দাও।

দারোয়ান তাকিয়ে দেখল, রোজ দিদিমণি দাঁড়িয়ে সব শুনছে।

সে তাড়াতাড়ি ন্যানসিকে বলল, যাও তুমি।

ন্যানসি সোজা উপরে উঠে এল। রোজ তাকে নিয়ে একটা ঘরে বসালো। মিষ্টি গলায় বলল, তোমাকে তো আমি চিনি না। বলো তো আমার সাথে দেখা করতে চাইছিলে কেন?

—আমার কোন স্বার্থ নেই। আপনাদের ভালোর জন্যেই—তা আপনাদের দারোয়ানটা এমন হতচ্ছাড়া—

—দারোয়ানের ব্যবহারের জন্যে আমি অত্যন্ত দুঃখিত। তুমি কিছু মনে করো না।

—ন্যানসি খুব অবাক হল রোজের মিষ্টি কথায়। এ রকম মিষ্টি ব্যবহার জানত সে কোনদিন পায়নি। তাই সে অবাক হয়ে বলল, আপনি আমার আসল পরিচয় জানেন না তাই এত ভালো ব্যবহার করছেন। আসল পরিচয় জানলে হয়তো আমার সাথে রূঢ় ব্যবহারই করতেন।

রোজ হেসে বলল, তোমার পরিচয় তো তোমার ব্যবহারে। এর আবার আসল নকল কি।

ন্যানসি বলল, আমি খুব গোপন খবরটি বলবো আপনার কাছে। হয়তো সে জন্যে আমাকে খুন করাও হতে পারে। তবু আমি বলতে বাধ্য। আপনি জেনে রাখুন, আমি হচ্ছি সেই মেয়ে যে অলিভারকে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়েছিল কুখ্যাত গুণ্ডা ফ্যাগিনের ডেরায়।

—তুমি নিয়ে গিয়েছিলে? রোজের চোখে মুখে বিস্ময়ের রেখা।

—হ্যাঁ আমিই। ন্যানসি আস্তে আস্তে বলল, জন্ম থেকেই আমি ওই সব দাগী আসামীদের মধ্যে বড় হয়েছি এবং ভালো মানুষ কাদের বলে জানি না।

—সত্যি ব্যাপারটা খুব দুঃখের। তোমার কথা ভেবে আমার খুব কষ্ট হচ্ছে।

—আপনার মনটা আপনার চেহারার মতোই সুন্দর। তাই আপনার কষ্ট হচ্ছে আমার জন্যে। এবার শুনুন আসল কথা—মংকস নামে একটি বদ লোক অলিভারকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চায়।

—সে কি? রোজ আঁতকে উঠল, অলিভারকে সরিয়ে দিয়ে তার লাভ কি?

—লাভ নিশ্চয় অনেক। আমি নিজের কানে একথা শুনেছি

বলেই ছুটে এসেছি। দেখুন আমি মেয়ে ভালো নই। তবু আমার মিনতি, আমার প্রতিটি কথাকে গুরুত্ব দেবেন। আজই মংকস ফ্যাগিনের সঙ্গে পরামর্শ করেছে। ফ্যাগিনকে এজন্য প্রচুর টাকাও দিয়েছে। ফ্যাগিনকে সে বলছিল, বাপের উত্তরাধিকারীকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারলে তার আর কোন চিন্তা থাকবে না।

—বাপের উত্তরাধিকারী? তার মানে ভাই?

—আমারও তাই মনে হচ্ছে। লোকটা হয়তো অলিভারের কোন রকম ভাই। অলিভারের বাবা প্রচুর ধন-দৌলত রেখে গেছে। মংকস অলিভারকে মেরে ফেলে সেই ধন-দৌলত একা ভোগ করতে চায়।

—ব্যাপারটা খুব চিন্তার তো। রোজ চিন্তিত মুখে বলল, আমি অবশ্যই উপযুক্ত জায়গায় জানাবো।

ন্যানসি উঠে পড়ে বলল, দেখুন যা কিছু করবেন খুব সাবধানে। আমি আপনার কাছে এসে এ খবর দিয়ে গেছি, একথা জানতে পারলে কিন্তু নির্ঘাত আমাকে খুন করবে।

রোজ ন্যানসির হাত ধরে বলল, তুমি তাহলে যেও না। আমি তোমাকে নিরাপদে রাখার সব ব্যবস্থা করছি।

ন্যানসি ম্লান হেসে বলল, আমাকে যেতেই হবে একজনের জন্যে। তাতে খুন হলেও কিছু করার নেই।

রোজ অবাক হয়ে বলল, কে সেই লোকটা যার জন্যে তুমি জীবনের ঝুঁকি নিয়েও যাচ্ছো।

—এই দলের মধ্যে সবচেয়ে যে ভয়ংকর তার জন্যেই আমাকে যেতে হবে। তাকে আমি ভালোবাসি।

ন্যানসি রোজের হাত ছাড়িয়ে এক পা এগোতেই রোজ বলল, আর একটু দাঁড়াও। দরকার হলে কোথায় তোমার দেখা পাওয়া যাবে?

—রবিবার রাত এগারোটা থেকে বারোটা পর্যন্ত ব্রীজের উপর আমাকে পাবেন।

এই বলে ন্যানসি হন হন করে চলে গেল। রোজ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। সত্যি, সমাজের এই সব খারাপ নীচুতলার মেয়েরাও কত মহৎ হয়। এদের মনের মধ্যেও কত করুণা জমা থাকে কেউ তার খোঁজ রাখে না।

## ॥ আবার ব্রাউনলো ॥

ন্যানসি চলে যাওয়ার পর রোজ কাজ শুরু করে দিল। মিসেস সেইলিকে মোটামুটি সব জানিয়ে সে হ্যারীকে চিঠি লিখে সব জানাল। অলিভারকে চোখে চোখে রাখার জন্য চাকর বাকরদের নির্দেশ দিল।

দুপুরের দিকে অলিভার ছুটতে ছুটতে তার ঘরে ঢুকে বলল, রোজ দিদি, একটা সুসংবাদ আছে।

রোজ হেসে বলল, বলে ফ্যাল দেখি।

অলিভার বলল, আমি গাড়ী করে আসছিলাম। সেই সময় দেখলাম মিষ্টার ব্রাউনলো একটা বাড়িতে ঢুকছেন। আমি চিনে রেখেছি সেই বাড়িটা। তুমি নিয়ে যাবে আমাকে?

—নিশ্চয় নিয়ে যাবো। তুমি অপেক্ষা করো। আমি তৈরী হয়ে আসি।

রোজ কিছুক্ষণের মধ্যেই জামা কাপড় বদলে তৈরী হয়ে এল। অলিভারের নির্দেশ মতো গাড়ী করে এসে হাজির হল ক্র্যাডেন ষ্ট্রীটের একটা বাড়িতে।

অলিভার গাড়ীর মধ্যে বসে থাকল। বাড়ির ভিতর একটা ঘরে বসে ছিলেন ব্রাউনলো আর গ্রীণউইগ।

রোজ নিজের পরিচয় দিয়ে ব্রাউনলোকে বলল, আপনাদের কথা অনেক শুনেছি। আপনার কাছে এসেছি একটা বিষয়ে পরামর্শের জন্য।

ব্রাউনলো বললেন, তুমি আমার মেয়ের মতো। নিশ্চয় তোমাকে আমি সাহায্য করবো। গ্রীণউইগ, তুমি একটু বাইরে যাও।

গ্রীণউইগ উঠে বাইরে যাবার উদ্যোগ করতেই রোজ বলল, না-না, উনিও থাকুন। আপনাদের দুজনের পরামর্শই আমার দরকার।

গ্রীণউইগ আবার চেয়ারে বসলেন।

রোজ বিনা ভূমিকায় বলল, অলিভার টুইষ্ট নামে একটি ছেলেকে আপনি যে দয়া দেখিয়েছিলেন, তা সে ভোলেনি। রোজই সে আপনার কথা বলে।

ব্রাউনলো বললেন, ছেলেটা তো খুবই ভালো ছিল। কিন্তু বদসঙ্গে পড়ে সে গোল্লায় গেল।

রোজ জোর দিয়ে বলল, না, সে গোল্লায় যায়নি। বদসঙ্গ থেকে নিজের চেষ্টায় বেরিয়ে এসে সে এখন খুবই ভালো ছেলে।

গ্রীণউইগ বললেন, অসম্ভব। আমি বলছি অলিভার কখনো ভালো হতে পারে না।

রোজ হেসে বলল, অলিভার এত ভালো যে তার ভালোত্বের সামান্য কিছু বুড়ো মানুষদের থাকলে পৃথিবীর চেহারা অন্য রকম হয়ে যেত।

গ্রীণউইগ বললেন, আরে, এতো আমাকেই লক্ষ্য করে কথাগুলো বললে দেখছি। তুমি তো ভারী ফাজিল মেয়ে।

ব্রাউনলো বিব্রত কণ্ঠে রোজকে বললেন, তুমি কিছু মনে করো না মা, আমার বন্ধুর কথাগুলো চোয়াড়ে। তবে মন থেকে উনি এসব বলেন না।

গ্রীণউইগ গর্জন করে বললেন, মন থেকেই বলি ;

ব্রাউনলো জোর দিয়ে বললেন, না, না, মন থেকে বলো না।

গ্রীণউইগ সমান জোর দিয়ে বললেন, আলবৎ আমি মন থেকে বলি।

—বলো না।

—বলি।

—খবরদার বাজে কথা বলবে না।

—তুমিও বাজে কথা বলবে না।

দুই বুড়ো দুইজনের দিকে হিংস্র চোখে তাকিয়ে থাকেন। মনে হয়, এক্ষুনি দুজনে দুজনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।

কিন্তু কি আশ্চর্য।

গ্রীণউইগ বললেন, এক টিপ নস্যি দাও।

ব্রাউনলো নস্যি দিয়ে বললেন, তোমার হাতটা দাও।

দুজনে গভীর আবেগে করমর্দন করলেন।

রোজ অবাক হয়ে দুজনের এ বিচিত্র বন্ধুত্ব দেখছিল। আবার বলল, ধন্য আপনারা। আপনাদের কথা অলিভারের মুখে শুনেছিলাম। আজ চোখে দেখলাম, অলিভার থাকলে খুব খুশি হত।

ব্রাউনলো বললেন, হ্যাঁ মা, এবার বল তো অলিভারের কথা।

রোজ সংক্ষেপে অলিভার সম্পর্কে সব কথা জানাল। শুনে ব্রাউনলো বললেন, তুমি অলিভারকে সঙ্গে আনলে না কেন?

—সঙ্গেই এনেছি। গাড়ীতে বসে আছে।

—তাই নাকি? তাই নাকি? আমি তাকে নিয়ে আসি। এই বলে ব্রাউনলো নিজেই গেলেন অলিভারকে আনতে।

সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো গ্রীণউইগ। রোজের কাছে এসে সশব্দে তার কপালে চুমু খেলেন। রোজ বলল, একি! একি!

গ্রীমউইগ বললেন, ঘাবড়াও মৎ। তুমি আমার নাতনীর বয়সী। আসলে তুমি খুব ভালো মেয়ে।

এই সময় ব্রাউনলো অলিভারকে নিয়ে ঢুকলেন। গ্রীণউইগ উঠে তার সঙ্গে করমর্দন করে বললেন, মিষ্টার্ অলিভার, তোমার সম্পর্কে আমার ধারণা পালটাতে পেরেছি, তাতে আমি সুখী।

খবর পেয়ে মিসেস বেডুয়িন এসে হাজির। তিনি অলিভারকে

জড়িয়ে ধরে কাদতে লাগলেন। হাসি-কান্নার পাট শেষ হলে রোজ চুপিচুপি ব্রাউনলোকে একসময় বলল, আপনার সাথে অলিভার সম্পর্কে জরুরী পরামর্শ আছে। এখানে বলা যাবে না।

—ঠিক আছে। আমি রাত আটটার সময় তোমাদের বাড়িতে যাবো। তখন সব কথা হবে।

রোজ অলিভারকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

## ॥ পরামর্শ সভা ॥

রাত আটটা নাগাদ ব্রাউনলো এলেন।

রোজ তাঁকে ঘরের মধ্যে এনে বসাল। ঘরের মধ্যে মিসেস মেইলি আর ডাক্তার লসবার্ণ ছিলেন। তাঁদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল।

ডাক্তার লসবার্ণ বললেন, আমার তো ইচ্ছে করছে সমস্ত দলটাকে এখনই পুলিশে ধরিয়ে দি।

ব্রাউনলো বললেন, আমাদের একটু মাথা ঠাণ্ডা রেখে চলতে হবে ডাক্তার। দলটাকে ধরিয়ে দিলে অলিভারের তো কোন লাভ হবে না।

—কেন? পুলিশে ওদের ধরলে ওরা আর অলিভারের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

—তা ঠিক। ব্রাউনলো বললেন, তবে তার আগে দরকার অলিভারের পিতৃ পরিচয় খুঁজে বের করা। তাহলে অনেক ব্যাপারই স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

—ঠিক আছে। তাই হবে। তবে ওদের সব কটাকে দ্বীপান্তরে না পাঠিয়ে আমার শান্তি হবে না।

—ব্রাউনলো বললেন, আমরা কেউ মংকসকে চিনি না। এ ব্যাপারে ন্যানসির সাহায্য নিতে হবে। আর গ্রীণউইগকেও

আমাদের সঙ্গে নিতে হবে। লোকটা খুব চালাক চতুর আর আইনজ্ঞও বটে।

লসবার্ণ রোজের দিকে তাকিয়ে বললেন, এ ছাড়া আর একজনের সাহায্যও আমাদের নিতে হবে। তাঁর নাম হ্যারী সেইলি—তিনি আমাদের এই তরুণী বন্ধুটির ঘনিষ্ঠ বন্ধু।

রোজ লজ্জিত হয়ে মুখ নীচু করল। মিসেস সেইলি বললেন, আপনারা কাজ করুন। যে ভাবেই হোক অলিভারের পিতৃ পরিচয় খুঁজে বের করুন। এ ব্যাপারে যত টাকা লাগে আমি দেব।

## ॥ ন্যানসি খুন ॥

ফ্যাগিন লোকটা যেমন ধূর্ত তেমনি শয়তান। কয়েক দিনের মধ্যেই সে বুঝে নিল যে ন্যানসির মধ্যে কোন পরিবর্তন ঘটে গেছে। সে আর আগেকার মতো তাদের সঙ্গে আড্ডা মারে না। হাত সাফাইয়ের কাজেও যেতে চায় না। চুপচাপ বসে বসে কি ভাবে।

ফ্যাগিন সাইকসকেও একথাটা জানাল। সাইকস মোটা বুদ্ধির মানুষ। সে এ সব উড়িয়ে দিল, ধ্যৎ। ন্যানসির মধ্যে আবার কি পরিবর্তন ঘটবে। যত সব বাজে ব্যাপার।

দেখতে দেখতে রবিবার এসে গেল। রাত যত বাড়তে লাগল, ন্যানসি তত চঞ্চল হয়ে পড়ল।

ন্যানসি সাইকস-এর কাছে গিয়ে বলল, আমার একটু কাজ আছে। আমি একটু ঘুরে আসি।

সাইকস ফ্যাগিনের সঙ্গে বসে মদ খাচ্ছিল। সে বলল, এত রাত্তিরে আবার কি কাজ? এখন বাইরে বেরোন হবে না।

ন্যানসি মিনতি করে বলল, আমাকে যেতে দাও দয়া করে।

আমি যাব আর চলে আসবো।

—না না এখন যাওয়া হবে না। সাইকস্ চড়া গলায় বলল।

—আমি যাবোই। ন্যানসিও মেজাজ দেখিয়ে বলল।

—কি? আমার সঙ্গে মেজাজ দেখানো। সাইকস উঠে গিয়ে ন্যানসির হাত ধরে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে দরজা বন্ধ করে দিল।

—ন্যানসি ভিতর থেকে চেঁচিয়ে বলল, কাজটা তুমি ভালো করছো না বিল।

সাইকস ফ্যাগিনের দিকে তাকিয়ে বলল, ওর মাথা নিশ্চয় খারাপ হয়ে গেছে। না হলে আমার সাথে এভাবে কথা বলবার সাহস হয়।

ভিতর থেকে ন্যানসি তখন দরজার গায় দুমদাম করে ধাক্কা মারতে মারতে বলল, আমাকে যেতে দাও। না হলে ভাল হবে না।

সাইকস চেঁচিয়ে বলল, চুপ করে থাক বলছি। আর একটা শব্দ শুনি তো তোর গলা টিপে আমি মেরে ফেলব।

ন্যানসি খিলখিল করে হেসে উঠল, মার না দেখি কেমন মুরোদ—মারো।

সাইকস তেড়ে যাচ্ছিল, ফ্যাগিন তাকে ধরে ফিসফিস করে বলল, আমার বিশ্বাস, ন্যানসি বিগড়ে গেছে। রবিবার রাত্তিরে ও কোন মতলব নিয়ে বাইরে যেতে চায়।

—চুলোয় যাক। সাইকস আবার মদের বোতল নিয়ে বসল।

গীর্জার ঘড়িতে ঢং ঢং করে বারোটা বাজল। সঙ্গে সঙ্গে ন্যানসিও চুপ করে গেল।

ফ্যাগিন ভালোমতোই বুঝতে পেরেছিল যে রবিবার রাত এগারোটায় নিশ্চয় কারো সাথে দেখা করতে চায়।

তাই সে একটা লোককে ঠিক করে রাখল, ন্যানসির পিছনে যাওয়ার জন্যে। ন্যানসিকে দূর থেকে একদিন দেখিয়ে দিয়ে বলল, এই মেয়েমানুষটাকে ছায়ার মতো অনুসরণ করবে, আর কি কথা

বলে শুনবে।

ফ্যাগিন আরও জানতো, সাইকস অত রাতে কিছুতেই ন্যানসিকে বেরোতে দেবে না। তাই পরের রবিবার কায়দা করে প্রচুর মদ খাইয়ে সাইকসকে নিজের ডেরায় আটকে রাখল।

ন্যানসি জেনে গেল, সাইকস রাত্তিরে ফিরবে না। রাত এগারোটা নাগাদ সোলগুন ব্রীজের উপর উঠে গেল। কুয়াশায় ভরা অন্ধকার রাত। পাশের লোককে ভাল করে দেখা যায় না।

ন্যানসির একটু দূরে যে একজন হেঁটে আসছে সে খেয়াল করল না। সে খুঁজছিল রোজকে, কিছুক্ষণ বাদেই সেখানে হাজির হল রোজ। সঙ্গে ব্রাউনলো।

ন্যানসি দূর থেকেই চিনতে পেরেছিল রোজকে। তাড়াতাড়ি তার কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, চলুন ওই সিঁড়ির কাছে।

রোজ বলল, গত রবিবার তুমি আসোনি।

ন্যানসি বলল, আমাকে ঘরের মধ্যে আটকে রেখেছিল। ব্রাউনলো বললেন, শোন ন্যানসি, তুমি আমাদের সাহায্য করো। আমি দলবল সমেত ফ্যাগিনকে হাজতে পোরার ব্যবস্থা করবো।

ন্যানসি মাথা নাড়ল, না, তা আমি পারবো না। ফ্যাগিন খুব খারাপ লোক, কিন্তু আমিও তো ভালো নই। আমিও তো ওই দলেরই।

—তাহলে মংকসকে চিনিয়ে দাও।

—তা দিতে পারি। মংকস দেখতে বেজায় লম্বা—বেশ হেলে দুলে হাঁটে—গায়ে সব সময় একটা লম্বা কোট—তার কলারটা আবার খুব উঁচু—গলা ঢেকে রাখবার চেষ্টা করে।

ব্রাউনলো বললেন, দাঁড়াও—দাঁড়াও—তার গলায় নিশ্চয় একটা লাল দাগ আছে। তাই না?

—তা আছে। আপনি কি করে জানলেন?

—অমনি জানলাম। ব্রাউনলো হেসে বললেন, বয়স তো কম হল না। অনেক কিছু জানতে হয়েছে আমাকে। যাক, এবার

বোধহয় আলোর রেখা দেখতে পাওয়া যাবে। তুমি খুব উপকার করলে ন্যানসি। রোজ বলল, তোমার জন্য কি করতে পারি ন্যানসি? ন্যানসি বলল, কিছু করতে হবে না। ব্রাউনলো বললেন, তোমাকে কিছু টাকা দিতে চাই। ন্যানসি বলল, আমার টাকা দরকার নেই। রোজ বলল, তুমি এত উপকার কবলে। অথচ কিছুই চাও না। ন্যানসি বলল, একটা জিনিস শুধু চাই—যদি কখনো আমার মৃত্যু সংবাদ পান, তবে আমার জন্য একটু প্রার্থনা করবেন।

বলতে বলতে ন্যানসি দ্রুতপায়ে চলে গেল। তার পাস থেকে সেই ছায়াটাও সরে গেল।

যথাসময়ে ফ্যাগিনের কাছে খবব পৌঁছে গেল। ফ্যাগিন বলল সাইকসকে। শুনে সাইকস ক্ষ্যাপা মোষের মতো ছুটতে ছুটতে নিজের ডেরায় চলে এল।

ন্যানসি ঘুমিয়ে পড়েছিল। তখনও ভোবের আলো ফোটেনি।

সাইকস এসে লাথি মেরে ন্যানসিকে জাগিয়ে দিল।

ন্যানসি ধড়মড় করে উঠে বলল, কখন এলে? দাঁড়াও। পরদা সবিয়ে দিই। ঘরে আলো আসুক। সাইকস ঠাণ্ডা গলায় বলল, ঘরে যেটুকু আলো আছে তাতেই আমি আমার কাজ করতে পারবো।

ন্যানসি ভয় পেয়ে বলল, তুমি অমনভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছো কেন বিল?

সাইকস বলল, আর তাকাবো না। এই আমার শেষ তাকানো।

এই বলে সাইকস ঝট করে এক হাতে ন্যানসির ঘাড় ধরে অন্য হাতে তার মুখ চেপে ধরল।

ন্যানসি সেই অবস্থাতেও বলল, আমাকে মেরো না বিল। আমি তোমাদের কোন ক্ষতি করিনি, বিশ্বাস করো, কোন ক্ষতি করিনি।

—চুপ করে থাক শয়তানী। এই বলে সাইকস তার ভারী পিস্তলটা বের করে উলটো পিট দিয়ে আঘাত করতে লাগল।

ন্যানসির মাথা ফেটে রক্ত ঝরতে লাগল। কপাল মুখ থেঁতলে

বীভৎস হয়ে গেল। সে বহু কষ্টে উপরের দিকে তাকিয়ে কি দেখল। তারপর মেঝেতে পড়ে গেল। কয়েকবার ঝাঁকুনি খেয়ে স্থির হয়ে গেল তার শরীর।

সাইকস উঠে একটা কম্বল এনে ঢেকে দিল ন্যানসির দেহ। তার শরীরেও অনেক রক্তের দাগ লেগেছিল। সে জল দিয়ে রক্তের দাগ ঘষে ঘষে তুলে ফেলবার জন্য অনেক চেষ্টা করল। কিছু কিছু দাগ উঠল। কিছু উঠল না।

সেই অবস্থায় সাইকস আবার পথে বেরিয়ে পড়ল। পথে তখন সূর্যের অফুরন্ত আলো। ন্যানসি আলো দেখতে চেয়েছিল। আর কোনদিন আলো দেখবে না।

ব্রাউনলো কদিন খুব ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করলো। তারপর একদিন সন্ধ্যেবেলা মংকসকে কোথা থেকে ধরে একেবারে নিজের বাড়িতে এনে তুললেন। তার সঙ্গে আরও দুজন লোক ছিল।

মংকসকে ঘরের মধ্যে বসিয়ে ব্রাউনলো বললেন, এবার তোমার সঙ্গে কাজের কথাটা সেরে নিই।

মংকস বলল, অলিভার নামে যে ছেলেটার কথা বলে আমাকে এখানে আনলেন, সে কোথায়?

ব্রাউনলো বললেন, সে যথাসময়েই হাজির হবে। তার আগে তোমার সাথে আমার কথাগুলো হয়ে যাক। আমি তোমার বাবার বন্ধু। আসা করি আমার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলবে।

মংকস বলল, বাবার বন্ধু বলেই তো আপনার সাথে চলে এলাম।

ব্রাউনলো বললেন, না—ঠিক সেই কারণে আসোনি। তুমি এসেছো ভাইকে একবার দেখে চিনে রাখতে যাতে পরে তার ক্ষতি করতে পারো।

—আপনি এমন ভাবে কথা বলছেন কেন?

—আমি ঠিকই বলছি। শোন—তোমার বাবার বিয়ের ইতিহাস আমার চেয়ে কেউ ভালো জানে না। তোমার বাবা তোমার মাকে বিয়ে করে একটুও সুখী হয়নি। দুজনের বনিবনা

ছিল না। তোমার মা তোমাকে নিয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতেন।

—আমার এসব জানা নেই।

—খুব জানা আছে তোমার। তুমি জ্ঞান হবার পর থেকে শুধু তোমার মাকেই দেখেছো—আর তোমার মা তোমাকে সবই বলে গেছে। তোমার বাবা আবার একটি মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন, তারা দু'বোন। বড় বোনকে তোমার বাবা গোপনে বিয়ে করেন। তার পরই তোমার বাবার হঠাৎ মৃত্যু হয়।

ব্রাউনলো একটু থেমে বললেন, মৃত্যুর আগে তিনি আমার কাছে এসে সব বলেছিলেন। আর সেই সময় তিনি আমাকে তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীর একটি ছবি দিয়ে গিয়েছিলেন। তোমার বাবার মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আমি তার খোঁজ করতে শুনলাম, সে কোথায় চলে গেছে কেউ জানে না। তারপর জানতে পারলাম অনাথ আশ্রমে একটি ছেলে প্রসব করবার পর তারও মৃত্যু হয়েছে। সেই ছেলেই অলিভার। আমার বাড়িতে সেই মহিলার যে ছবি আছে তার সাথে অলিভারের চেহারার মিল দেখে আমার মনে প্রথম দিনই সন্দেহ হয়েছিল।

মংকস বলল, অলিভারের মা যে আমার বাবার স্ত্রী তার প্রমাণ কোথায়?

ব্রাউনলো বললেন, প্রমাণ তুমি নদীর জলে লোপাট করে ফেলেছো, একথা তুমি অস্বীকার করতে পারো? আদালতে মামলা উঠলে আসল লোকই সাক্ষী দেবে। তাহলে তুমি শেষ পর্যন্ত আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে চাও? মংকস ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

ব্রাউনলো বললেন, তুমি টাকা দিয়ে ফ্যাগিনদের হাত করেছো। তোমার জন্য ন্যানসি খুন হয়েছে। এর পরও তুমি সব অস্বীকার করবে?

মংকস ঈষৎ ভীত হয়ে বলল, আপনি আমাকে কি করতে বলেন?

ব্রাউনলো বললেন, আমি চাই তুমি অলিভারকে তোমার

পিতার সম্পত্তির অর্ধেক ফিরিয়ে দাও।

—ঠিক আছে। আমি তাই দেব। কিন্তু আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে আমার বিরুদ্ধে কোন মামলা আনবেন না।

আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, আমি আদালতে যাবো না তোমার বিরুদ্ধে। তুমি একটা দানপত্র লিখে দাও অলিভারের নামে।

ব্রাউনলোর নির্দেশে মংকস দানপত্র লিখে দিল। সাক্ষী হিসাবে ঘরের দুজন লোক সই করল।

## ॥ পাপের শাস্তি মৃত্যু ॥

সাইকস তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো এখন পথে পথে ঘুরছে। পুলিশ তাকে ভীষণ ভাবে খুঁজছে। এছাড়া ন্যানসি খুনের ঘটনা তার চেনাজানা মহল জেনে গেছে। ন্যানসিকে সে জঘন্য ভাবে খুন করেছে, সে জন্যে চোর গুণ্ডা ডাকাতদলের লোকেরাও তার উপর বিরক্ত। কেউ তাকে আশ্রয় দেয় না।

ঘুরতে ঘুরতে সে এসে হাজির হল টেমস নদীর ধারে এক বস্তী অঞ্চলে।

এখানে চোরগুণ্ডাদের একটি ডেরা আছে। সাইকস একমুখ দাড়ি গোঁফ নিয়ে সেখানে ঢুকে পড়ল। সেখানে তখন টোবি, চিটলিং এবং আরো কয়েকজন বসে ছিল।

সাইকসকে দেখে ওরা সবাই চুপ করে গেল। সাইকস টোবিকে বলল, এখানে আমি থাকবো। টোবি কোন কথা বলল না। ভাব দেখে মনে হল, সাইকসকে থাকতে দেবার ইচ্ছা নেই।

সাইকস আবার বলল, কি হল? কথা বলছো না কেন? আমার থাকার জায়গা নেই। পুলিশ হন্যে হয়ে আমাকে খুঁজছে। আমাকে থাকতে দাও এখানে।

টোবি বলল, যদি এখানে থাকা নিরাপদ মনে কর, থাকতে পারো।

সাইকস বিড় করে বলল, কতক্ষণ আর নিরাপদে থাকা যাবে।

ফ্যাগিন কোথায় ?

টোবি বলল, ফ্যাগিনকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। সাইকস হাঁ হয়ে গেল, ফ্যাগিনকেও পুলিশ ধরতে পারল। আশ্চর্য।

চিটলিং তিক্তস্বরে বলল, কিসের আশ্চর্য। সবই তো তোমার জন্য হল। পুলিশ হানা দেওয়ার পর আমি আর চার্লি ঘরের চিমনি বেয়ে উপরে উঠে ছাদ দিয়ে পালিয়েছি। বোলটার চৌবাচ্চার মধ্যে লুকিয়ে ছিল। পুলিশ তাকেও ধরেছে। ন্যানসির মৃতদেহ পাবার পর থেকে তো পুলিশ আরো মরীয়া হয়ে গেছে। একদল বড় মানুষ বলেছে, ন্যানসির খুনীকে যে করেই হোক ফাঁসি কাঠে চড়াতে হবে।

সাইকস হতাশ হয়ে বসে পড়ল। সে বুঝতে পারল, ধনী মানুষরা বহু টাকা ঢালছে। এবার আর তার নিস্তার নেই। ন্যানসির মতো একটা মেয়ের খুনের জন্যে ওরা এত ক্ষেপে উঠল কেন ? ন্যানসি মরে গেছে তো ওদের কি।

সাইকস যখন এই সব কথা ভাবছে, তখন সেখানে ঢুকল চার্লি।

সাইকসকে দেখে সে টোবিকে বলল, ও এখানে এসেছে কেন ?

টোবি বলল, কোথায় জায়গা না পেয়ে এখানে এসেছে।

চার্লি চেঁচিয়ে বলল, না-না। ন্যানসির খুনীকে এখানে জায়গা দেওয়া হবে না ওকে তাড়িয়ে দাও।

সাইকস চার্লির দিকে তাকিয়ে বলল, এসব তুই কি বলছিস চার্লি ? তোর এত সাহস ?

চার্লি আরো জোরে চেঁচিয়ে বলল, একশোবার বলবো। তুমি একটা খুনী, তুমি একটা দানব।

সাইকস-এর রক্ত গরম হয়ে উঠল। সে-ও চেঁচিয়ে বলল, চুপ কর চার্লি। তোকে আমি খুন করে ফেলবো।

চার্লি এই কথা শুনে এক লাফ দিয়ে সাইকস-এর ঘাড়ে পড়ে দুহাতে তার গলা টিপে ধরে বলল, খুন করবে—আমাকে খুন করবে—খুন করতো এবার—

সাইকস এক ঝটকায় চার্লিকে নীচে ফেলে দিল। তার গায়ে

অসুরের মতো শক্তি। চার্লির মতো অল্প বয়সের ছেলে তার সাথে পারবে কেন।

সাইকস তাকে মাটিতে ফেলে পা দিয়ে গলা চেপে ধরল। যন্ত্রণায় চার্লির মুখ নীল হয়ে গেল। তার চোখ ঠেলে উঠল।

ঠিক এই সময় শোনা গেল বাড়িটার বাইরে বহু লোকের গলা—এই বাড়ি—এই বাড়িতে সেই খুনী গুণ্ডাটা লুকিয়ে আছে।

চার্লি সেই অবস্থাতেই চেঁচিয়ে বলল, শয়তানের বাচ্চাটা এখানেই আছে। তোমরা দরজা ভেঙে ঢোক।

সাইকস এক হ্যাঁচকা টান দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল।

নীচে তখন দরজা দুমদাম করে লাথি মারা হচ্ছে। দরজা ভেঙে পড়ল বলে।

সাইকস একগাদা লম্বা দড়ি নিয়ে টিকটিকির মতো দেওয়াল বেয়ে বাড়িটার ছাদে উঠে গেল। ছাদ থেকে চিমনি বেয়ে একেবারে উপরে।

আশে পাশের ছাদ থেকে সবাই চেঁচিয়ে উঠল। ওই যে গুণ্ডাটা ছাদে উঠেছে। ধর—ধর ওকে।

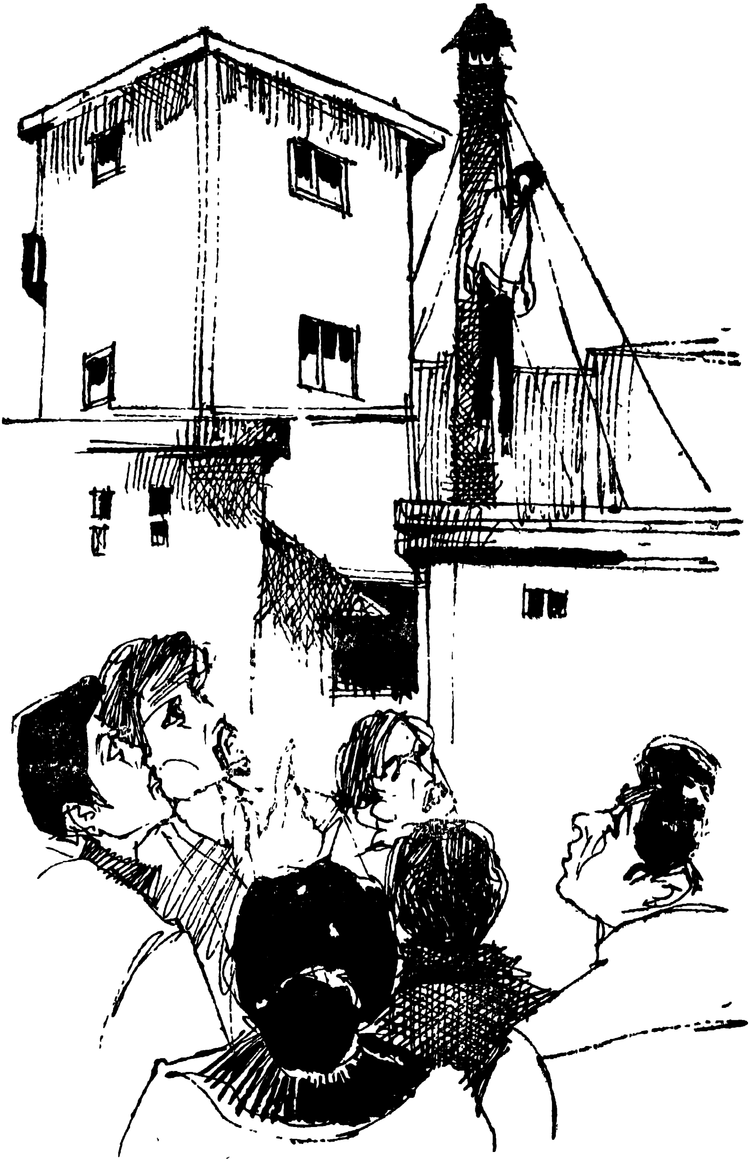
নীচ থেকে এক ভদ্রলোক চেঁচিয়ে বললেন, যে ওকে জ্যান্ত অবস্থায় ধরতে পারবে, তাকে পঞ্চাশ গিনি নগদ দেব।

এদিকে মড়মড় করে দরজা ভেঙে পড়ল। জলের স্রোতের মতো লোক ঢুকে পড়ল বাড়িটায়।

সাইকস ততক্ষণে চিমনির মাথায় দড়িটার একটা দিক বেঁধে ফেলেছে। অন্যদিকে তৈরী করল একটা ফাঁস। এবার সে এই দড়ি ধরে ঝুল খেতে খেতে নদীর জলে নেমে যাবে।

সাইকস দড়ি ধরে ঝাঁপ দিল। আর সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসটা তার গলায় আটকে গেল। তারপর সেটা শক্ত হয়ে তার গলায় বসে গেল। জিভ বেরিয়ে এল সাইকস-এর। কয়েকবার শূন্যে হাত পা ছুঁড়ে স্থির হয়ে গেল তার দেহ।

শূন্য থেকে ঝুলতে লাগল সাইকস-এর প্রাণহীন দেহ।



## ।। মধুরেন সমাপয়েৎ ।।

সাইকস-এর মৃত্যুর পর কদিন কেটে গেল। সন্ধ্যের সময় মিসেস সেইলির বাড়িতে বসে আছেন মিসেস সেইলি, রোজ আর অলিভার।

ব্রাউনলো আজ তাদের কিছু বলবেন। সেইজন্যে তারা প্রতীক্ষা করছে।

ব্রাউনলো এলেন নির্দিষ্ট সময়ে। সঙ্গে মংকস আর গ্রীণউইগ। ব্রাউনলোর হাতে একতাড়া আইনের কাগজপত্র। অলিভারকে দেখিয়ে তিনি বললেন, মংকস, এই তোমার বৈমাত্রেয় ভাই অলিভার।

মংকস আর অলিভার দুজনে তাকিয়ে রইল দুজনের দিকে। মংকস-এর চোখে চাপা বিদ্বেষ। অলিভারের চোখে বিস্ময়।

ব্রাউনলো বললেন, মংকস, এদের সামনে তুমি যা জানো বলো।

মংকস বলল, আমার বাবা রোমে গিয়ে খুব অসুস্থ হয়ে পড়লে মা বাবাকে দেখতে যায়। বাবার মৃত্যু হলে তার কাগজ পত্রের মধ্যে উইল পাওয়া যায়। এই উইলে তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী এবং তার ভবিষ্যৎ সন্তানকে সম্পত্তির অর্ধেক দেবার কথা ঘোষণা করেছিলেন। আমার মা উইলটি নষ্ট করে ফেলেন। তারপর তার দ্বিতীয় স্ত্রী অ্যাগনেসের নামে যা তা অপবাদ দিতে শুধু করেন। অ্যাগনেস মনের দুঃখে বাড়ি ছেড়ে কোথায় চলে যায়। অ্যাগনেসের বাবাও মারা যায় এর পর।

ব্রাউনলো বললেন, তারপর ?

মংকস বলল, মা কি ভাবে জানতে পেরেছিলেন, অ্যাগনেসের একটি ছেলে হয়েছে। মৃত্যুকালে মা সেই ছেলের কথা আমাকে বলে যায় এবং সেই সঙ্গে এও বলে—এই ছেলে বেঁচে থাকলে তুই

কোন সম্পত্তি ভোগ করতে পারবি না। মায়ের এই কথা শোনার পর থেকেই আমি ফ্যাগিনের সাহায্য নিই।

ব্রাউনলো বললেন, তারপরের ঘটনা তো আমরা সবাই জানি। আচ্ছা মংকস, তুমি অ্যাগনেসের ছোট বোনকে কখনো দেখেছো ?

মংকস বলল, হ্যাঁ, আমি তাকে কয়েকবার দেখেছি। অ্যাগনেসের বাবা মারা গেলে মেয়েটি নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছিল। এক গরীব মানুষ তাকে মানুষ করছিল। আমার মা ঠিক তাকে খুঁজে খুঁজে বের করেছিল। আমাকে সঙ্গে নিয়ে মা যেত সেই গরীব মানুষটির বাড়িতে। সেই সময় মেয়েটিকে কয়েকবার দেখেছি।

ব্রাউনলো বললেন, তারপরের ঘটনা কিছু জানো ?

মংকস বলল, শুনেছি মা সেই ছোট মেয়েটির নামে এমন সব অপবাদ দিয়েছিল যে সে তাকে তাড়িয়ে দেয়। তারপরের কথা আর জানি না।

ব্রাউনলো বললেন, তাবপরের ঘটনা আমি বলছি। তাড়িয়ে দেবার পর এক ধনী করুণাময়ী মহিলা তাকে নিজের মেয়ের মতো মানুষ করেন।

রোজকে দেখিয়ে বলল, তোমার সামনে এই যে রূপবতী মহিলা বসে আছেন, ইনিই হতভাগী অ্যাগনেসের ছোট বোন—আমাদের অলিভারের আপন মাসী।

রোজ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল অলিভারের দিকে। তারপর ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় অস্থির করে দিল, তুই আমার দিদির ছেলে—আমার সেই দিদি—যে ছিল আমার মায়ের মতো—

বলতে বলতে কাঁদতে লাগল রোজ।

অলিভারের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। কাঁদতে কাঁদতে বলল, তাইতো তোমাকে দেখলেই আমার মায়ের কথা মনে পড়ত। মাকে আমি দেখিনি, মনে হোত তুমি আমার মা।

সেই করুণ দৃশ্য সবার অন্তরকে যেন নাড়া দিয়ে গেল।

সেই সময় ঘরে ঢুকল হ্যারী।

ঘরের সকলকে চুপ করে বসে থাকতে দেখে বলল, আমার আসতে দেরী হয়ে গেল। ব্রাউনলো বললেন, না আসার চেয়ে দেরীতে আসাও ভালো।

হ্যারী রোজের দিকে তাকিয়ে বলল, দেরীর কারণ অবশ্য ওই মিষ্টি মেয়েটি। আমি ওকে বিয়ে করতে চেয়েছিলাম। ও বলেছিল যে ওর নাকি অনেক অপবাদ আছে আর আমাব নাম ডাক নাকি প্রচণ্ড। তা আজ আড়াল থেকে শুনে বুঝলাম, রোজের অপবাদ একেবারেই ভিত্তিহীন। একটি মহিলার চক্রান্ত এটা। এখন তো আর আমার প্রস্তাবে ওর আপত্তি নেই।

রোজ অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, আছে। হ্যারী অবাক হয়ে বলল, এখন আবার কিসের আপত্তি। রোজ বলল, তুমি বিরাট লোক, আব আমি খুব ছোট। হো হো করে হেসে উঠল হ্যারী, এই ব্যাপার? তাহলে শুনে রাখো। আমি আমার সেই বড় চাকরী আর আইনসভার সদস্য পদও ছেড়ে এসেছি। এখন আমি একটা গ্রাম্য পাদরীর চাকরী নিয়ে শান্ত জীবন কাটাবো। এখন আর আপত্তি নেই তো?

রোজ হেসে মুখ নীচু করল।

মিসেস সেইলি বললেন, আজ আমার খুব আনন্দের দিন। অলিভার পেল তার মাসীকে, আর আমি পেলাম ছেলের বউকে।

ব্রাউনলো বললেন, আর আমরা পেলাম কি? মিসেস সেইলি বললেন, আপনাদের জন্যে আছে মিষ্টি।

তিন মাসের মধ্যেই হ্যারী আর রোজের বিয়ে হয়ে গেল। ওরা চলে গেল একটা গ্রামে। মিসেস সেইলিও তাদের সঙ্গে চলে গেলেন।

ব্রাউনলো অলিভারকে পুত্র হিসাবে দত্তক নিলেন। অলিভার-কে নিয়ে তিনিও সেই গ্রামে বাস করতে লাগলেন। ডাক্তার লসবার্ণও তাদের সঙ্গে এসে জুটলেন।

গ্রীণউইগও প্রতি রবিবার আসতে লাগলো। তার কাজ হল, পাদরী হিসাবে হ্যারীর বক্তৃতার খুঁত বের করা আর ব্রাউনলোর সঙ্গে ঝগড়া করা।

সকলের যত্নে ও স্নেহে অলিভার হয়ে উঠল আদর্শ একটি ছেলে।

॥ শেষ ॥